মাধবীর বিদ্রোহ

বাঁচিবার উপায় প্রণেতা

শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ

প্রণীত

—০:০:০—

সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ১৷০

প্রকাশক—
শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ
স্বস্ত্যয়ন-সাহিত্য মন্দির
মহেশপুর পোঃ (যশোহর)

প্রাপ্তিস্থান—
গ্রন্থকার—শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ
যশোহর পোষ্ট ও প্রকাশকের নিকট
এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়।

প্রিণ্টার শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস;
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

ঈশ্বর মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণ নাথ ন্যায়পঞ্চানন

Nandan Press, Calcutta

উৎসর্গপত্র

ঈশ্বর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত—

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের

চরণোদ্দেশে—

আপনি আমার আচার্য্য, শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। আপনার নিকট যে জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম—তাহাই আমার জীবন-সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। তাহারই দক্ষিণা—আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা। ইতি—

পূর্ব্বস্থলী
জিলা বর্দ্ধমান
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
১৩৩৪ সাল।

প্রণত—

গ্রন্থকারের নিবেদন

মাধবীর বিদ্রোহ প্রকাশিত হইল। উপন্যাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয় আমাদের দেশের যুবকগণ যেরূপ গোলামীর মোহে অন্ধ—তাহাদের চৈতন্য-সম্পাদন করা দুই একখানি পুস্তকের দ্বারা সম্ভবপর নয়। তবু চেষ্টা, তাই বেকার যুবকদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। সুন্দর সুললিত ভাষায় লেখার শক্তি আমার নাই। তবে আমার হৃদয়ের কথা সরল ভাষায় জানাইলাম। এই পুস্তকে আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি—যে বঙ্গদেশের যুবকদের চাকরির জন্য হা-হুতাশ করিবার কোনও দরকার নাই। এই পুস্তকখানি মরণোন্মুখ বাঙ্গালী জাতির একজনেরও যদি 'বাঁচিবার উপায়' নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে—তাহা হইলে শ্রম ও অর্থব্যয় সফল বলিয়া মনে করিব।

আমার পূর্ব্ব পুস্তক "বাঁচিবার উপায়"—সুধীবর্গের নিকট আদৃত হইয়াছে—আশা করি তাঁহারা মাধবীর বিদ্রোহকেও কৃপার চক্ষুতে দেখিবেন।

আমার এই পুস্তক প্রকাশের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্তবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণ সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ ভারতী মহাশয়ের নিকট ও শ্রীযুক্তফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি ঋণী, ইঁহাদের উৎসাহ ও সহায়তা ব্যতীত এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি কখনই সাহসী হইতাম না।

যশোহর
২৪-১-৩৪

ইতি—
গ্রন্থকার।

সপুত্র রামহরি ভট্টাচার্য্য

Nandan Press, Calcutta

সাথবীর বিদ্রোহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"কি হে কুমুর ভায়া কখন বাড়ীতে শুভাগমন হল? ভাল আছ ত?" ঘনশ্যাম সার্বভৌম মহাশয় প্রশ্ন করিলেন।

"এই যে দাদামশায়, আগে পায়ের ধূলো দিন—পরে বলছি।"

"থাক্ থাক ভায়া এমনিই আশীর্ব্বাদ করছি।"

"আপনার আশীর্ব্বাদই ত আমাদের ভরসা। এই কতক্ষণ আসছি। আপনার 'মৃচ্ছকটিক' এনেছি।"

"বেশ ভায়া, বড় উপকার হল, এখন কেমন আছ বল দেখি?"

"আছি মন্দ নয়। আপনি ভাল আছেন ত?"

"আমি আর কি ভাল থাকব ভায়া, তোমরা ভাল থাকলেই আমার ভাল থাকা হল। আমার ত যমরাজার এজলাসে তরফ— হুকুমই হয়ে আছে। এখন যেতে পারলেই হয়। তবে কি জান, অনেকদিন পৃথিবীটার সঙ্গে মুলাকাত হয়েছে তাই মায়াটা কাটাতে প্রাণটা কেমন কেমন করে।"

"যাবেন কি দাদামশায়? টুনুবাবুর বিয়ে দিন, নাতবৌকে নিয়ে আমোদ প্রমোদ করুন তার পর যাবেন।"

"ভায়া, নাতবৌ নিয়ে আর আমোদ করার ইচ্ছা নেই। টুনুবাবুর বাবাটা দিন দিন যে রকম বদখেয়ালী মেরে যাচ্ছে তাতে সরে পড়তে পারলেই বাঁচি।"

"কেন শশী কাকা আবার কি করল?"

"ভায়া, তোমাদের কি কিছু জানতে বাকি আছে? আজ-কাল রাত্রিতে প্রায় বাড়ীই আসে না। কোন দিন হয়ত মদ খেয়ে থানায় পড়ে মরে থাকবে তাই ভেবে ভেবে মনে একটুও সুখ নেই।"

"তা আপনি কেন একটু শাসন করেন না?"

"ভায়া, এখন কি আর সে দিন আছে। এখন যে হাতের চেয়ে আম বড় হয়ে গিয়েছে। জানো ত' ভায়া—প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে—।"

"হাঁ, তা'ত' জানি, তবে সেটা শান্তশিষ্ট ছেলেদের পক্ষে। আর আপনিও জানেন—মূর্খস্য—"

"হাঁ সবই ত বুঝি ভায়া, কিন্তু সে ঔষধ খাওয়ান ত' আমার মত বৃদ্ধের কাজ নয়। জোয়ান-মরদ ছেলে, যদি উল্‌টে আমাকেই খাইয়ে দেয় তখন কি হবে?"

"বলেন কি দাদামশায়, শশীকাকাত ভয়ানক বদ হয়ে গিয়েছে দেখছি আপনাকে লাঠি মারবে?"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখখানি মলিন হইয়া গেল। বিরক্তি ব্যঞ্জকস্বরে তিনি উত্তর দিলেন—"ভায়া, সকলই অদৃষ্ট। সাধে কি ভায়া সরে পড়তে চাচ্ছি?"

যুবক বুঝিল পুত্রের নিন্দাবাদে বৃদ্ধপিতা অন্তরে ব্যথা অনুভব করিয়াছেন। তখন সে উত্তর করিল—"তাই বলে আপনার এখন সরে পড়াটা কি ভাল হবে? বরং আপনি বেঁচে থাকলে কাকাকে সুধ্‌রে রেখে যেতে পারবেন। পিতার কর্ত্তব্য উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের অত্যাচার ধীর ভাবে সহ্য করে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা। আপনাকে আমরা আর কি উপদেশ দেব দাদামশায়? আপনি কিন্তু ধৈর্য্য হারাবেন না।"

বৃদ্ধ একগাল হাসিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ ভায়া, ঠিক বলেছ। ছেলের এইটুকু আবদার যদি সহ্য করতেই না পারলাম তবে ছেলের বাবা হওয়া উচিত হয় নি।"

"দাদামশায়, আপনার অবস্থা দেখে আমার কিন্তু বেশ জ্ঞান হল।"

"তোমার আবার কি জ্ঞান হল ভায়া?"

‘ছেলের ঐ আবদার সইতে পারব কিনা তাই ভেবে চিন্তে বিয়ে করা না করা স্থির করবো।”

“হাঁ ভায়া, ভেবে চিন্তে যে যা করে তা আমার জানা আছে। ভাবাভাবি সব বিবাহের পূর্ব্বে; বিবাহ করলে আর ভাববার সময় পাবে না ভায়া, তখন আপনিই ছেলে হতে আরম্ভ হয়ে যাবে। তখন কি আর ভাববার অবসর থাকবে?”

“এখনও ত বিয়ে করিনি, তাই আমার ভাববার যথেষ্ট অবসর আছে।”

“আর তোমাকে অধিক দিন ভাবতে হবে না। তুমি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছ শুনে অলকানন্দপুরের জমিদার তোমার মার কাছে ঘটক পাঠিয়েছিলেন।”

“ঘটক পাঠালেই যে বিয়ে করতে হবে তার ত কোন কথা নেই। আমি ত ফাঁদে পা দিচ্ছিনে দাদামশায়।”

“বল কি ভায়া, তোমার মার ও সেখানে বিবাহ দেওয়ার খুব ইচ্ছা দেখলাম। আর রেখে দাও ভায়া তোমার মত অনেক বিবাহ বৈরাগী যুবক দেখেছি।”

এই কথা শুনিয়া কুমুদের মুখখানি ম্লান হইয়া যাইল।

সে ধীরে ধীরে কহিল—“মার সেখানে বিয়ে দেওয়ার মত হয়েছে—পাকা কথা দিয়েছেন নাকি?”

সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে মা যদি পাকা কথা দিয়া থাকেন তবে তাহার উপায় কি হইবে? সে যে সুরমাকে

প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে। সুরমা ব্যতীত এ হৃদয়ে ত অন্যের আসন হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল।

"কি ভায়া বিবাহের কথায় এত বিচলিত হচ্ছ কেন?"

"না দাদামশায় বিচলিত হব কেন? বিয়ে ত আমি করচি নে।"

"ও-রকম সকলেই বলে থাকে ভায়া, ওটা আর নূতন কথা কি? ও-ত আজকালের ভাষার অঙ্গ বিশেষ।"

"আচ্ছা আমাকে দেখে নেবেন।"

"না ভায়া, তুমি আর এ যোগাযোগে গোলযোগ বাধিয়ে বস না। আমরা কত আশা করে বসে আছি। মিষ্টান্নর ছড়াছড়ি ছড়াছড়ি যাবে। আমরা কয় দিন আকণ্ঠ খেয়ে নেব। তুমি আর তাতে আমাদের নিরাশ করো না ভায়া! আমরা জন কতক ইতর আছি আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমার কি লাভ হবে—বল?"

"না দাদামশায় আমি আর কিছুতেই বিয়ে করছি নে।"

"না ভায়া, তা হবে না। বিবাহ তুমিত করবেই তা আমাকে কেন ফাঁকি দেবে?"

"ফাঁকি আর কই দিচ্ছি। বিয়ে যদি করি তখন কি আপনাকে ফাঁকি দিতে পারব?"

"আমি যে গঙ্গাপানে ঠ্যাং বাড়িয়েই বসে আছি ভায়া,

কোন দিন ঠুস্‌করে মরে যাব। আমার ভাগ্যে তা হলে কি করে জুটবে ?”

“দাদামশায়, আপনি সন্দেশ খাবার লোভে আমাকে এইরূপ বিপদে ফেলতে চান ? আচ্ছা আপনি কত সন্দেশ খেতে পারেন আমি খাওই তা আপনাকে খাওয়াব।”

“তোমায় বিপদে কি ফেল্‌লাম ? ভায়া সে সন্দেশ খাওয়া আর এ সন্দেশ খাওয়া অনেক তফাৎ। তা যাই বল ভায়া, তোমাকে শেষে বিবাহ করতেই হবে। তখন আর লোক হাসিয়ে কি লাভ হবে বল ?”

“বলেন কি দাদামশায় ? বিয়ে যে আমাকে করতেই হবে, তা আপনি কি করে জানলেন ?”

“জানি হে ভায়া, জানি। আমি আর আমার ভাবী নাত বৌকে দেখিনি কিনা ? সে কি যে সে লোকের মেয়ে ! দেবে থোবেও যথেষ্ট—১২০০৲ টাকা আয়ের একটা তালুক আর ৪০০১৲ টাকা নগদ। এ ছাড়া গহনা ও জিনিষপত্রের ত কথাই নাই।”

“এত দেবে তা আপনি কি করে জানলেন ?”

“তবে শুনলে কি ? আমি যে তোমার রাধারমণদাদার সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।”

কুমুদের মুখখানি আরও বিমর্ষ হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল—“দাদা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন নাকি ? পাকা কথা দেন নি ত ?”

"ভায়া, বিয়ের কথায় অমন করছ কেন? পাকা কথা দেওয়া হয় নি।"

"আচ্ছা মেয়ে কেমন দেখে এলেন বলুন দেখি?"

"হুঁ ভায়া, এইবার পথে এস। বিবাহ যে করবে না? তা ভাল ভায়া, ভাল। মেয়েটি নাকি ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। পড়াবার জন্য একজন মেমসাহেব নিযুক্ত আছে কিনা। তা আমার ভাবী নাতবৌ সরস্বতী বটে।"

"আচ্ছা গুণে ত সরস্বতী হল বুঝলাম, রূপে কি তা বলুন দেখি?"

"তোমার দাদা যখন পছন্দ করেছেন, তখন কি আর মন্দ হতে পারে ভায়া।"

"না দাদামশায়, আপনি নিশ্চয়ই আসল কথা চেপে যাচ্ছেন। রংটা কেমন ঠিক করে বলুন দেখি?"

"না ভায়া, আমি ঠিকই বলছি। আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আমার কি আর সেরূপ দৃষ্টি আছে? তা' তোমার দাদা বলছিলেন যে মেয়েটি শ্যামাঙ্গী। তা ভায়া শ্যামাঙ্গী ত উত্তমা স্ত্রী বলেই খ্যাত—তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা—।"

"দাদামশায়, তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ যে কেমন তা ত আমি কখন দেখিনি। যাও বা বিয়ে করতাম তা আর করছিনে। দাদা ও মা জোট করে যে বিষয়ের লোভে একটা কাল-পেঁচা ঘরে আনবেন, তা আমি হতে দেবনা।"

"এই মাটি করলে দেখছি। শেষে এই বুড়কে নিমিত্তের ভাগী করবে? ভার্য্যা রূপবতী শত্রু—।".

"থাক দাদামশায়, আর শ্লোক আওড়াতে হবে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।"

"যাই বল ভায়া, বিবাহ তোঁমাকে করতেই হবে। তোমার মার অনুরোধ কি তুমি ঠেলতে পারবে? ভায়া, আমি দেখে দেখে বুড়িয়ে গেলাম। তোমার ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি কোথাও প্রেমে পড়ে গিয়েছ। ভায়া ওসব রূপজ মোহ। ও কিছুই নয়। একেবারে রাতারাতি বড় লোক, এমন সুযোগটা কি ভায়া ত্যাগ করতে আছে?"

"দাদামশায়, প্রেমে পড়ার কথা নয়। যাকে চিরদিনের জীবন সঙ্গিনী করতে হবে, তাকে ভাল করে দেখে শুনে ও তার অন্তরটা না জেনে কি গ্রহণ করা উচিত? বিষয় ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু।"

"ভায়া সে রকম ত হিন্দুর মধ্যে জানার উপায় নাই। আমাদের মধ্যে ত আর কোর্টশিপ হয় না।"

"কোর্টশিপ নাই থাকল। কথাতেই আছে—আগে দর্শনধারী তবে গুণবিচারী। তা দেখতেই যদি মন্দ হল, তবে অর্থের লোভে বিয়ে করাটা কি ভাল?"

"মেয়েটি যে কুরূপা তা ত বলা যায় না। যাদের মেয়ের রংটা ময়লা হবে তাদের মেয়ের কি বিবাহ হবে না?"

"তা হবে না কেন? তবে ভাল পেতে কি মন্দ লওয়া উচিত?"

"যা ভাল বোঝ কর ভায়া, বিবাহ কারও নিজের ইচ্ছায় হয় না। উহা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, সেটা আমি বেশ জানি। আমি একজন ভুক্তভোগী। আমিও একদিন বিবাহের ভয়ে দেশ ছেড়ে পলায়ন করেছিলাম। কিন্তু শেষে সেই মেয়েকেই বিবাহ করতে হোল। পিতৃদেবেরই জেদ বজায় থাকল।"

"সত্যি নাকি দাদামশায়, আপনিও ত কম নন। আপনার বিয়ের গল্পটা কিন্তু আমাকে শুনাতে হবে।"

"তাতে আর কি ভায়া শুনলেই হল। আমি এক পায়েই খাড়া হয়ে আছি। কি জানো ভায়া গল্পটা কাহকে করা হয়নি কিনা - তাই বলারও একটা আগ্রহ আছে।"

"তবে এখনি বলুন না কেন?"

"আচ্ছা শোন" — ঘনশ্যাম বলিতে আরম্ভ করিলেন —

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে হল বহুদিনের কথা। তখন আমার বয়স ১৯ কি ২০ বৎসর হবে। আমরা কুলিন কিনা, তাই পাত্রী পক্ষের আবেদন নিবেদন আমার পিতৃদেবকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। আমার দুই মা ছিলেন কাজেই সংসারে সর্ব্বদা অশান্তির স্রোত বয়ে যেত। সে জন্য আমি বিবাহের বড়ই বিরোধী হয়ে পড়েছিলাম। যে দিন মা আমার অশান্তির হুতাশনে দগ্ধ হয়ে স্বর্গারোহণ করলেন। সেই দিন আমি মনে মনে স্থির করে রেখে দিলাম বিবাহ করা হবে না। যদি নিতান্তই বিবাহ করতে হয় তবে বিমাতা বর্ত্তমানে ত নয়ই। পিতৃদেব যে দিন জেদ ধরলেন যে আমাকে বিবাহ করতেই হবে। সেই দিন শেষ রাত্রিতে উঠে একমাত্র ধুতি চাদর সম্বল নিয়ে বাহির হয়ে পড়লাম। সারাদিন পদব্রজে গমন করে সন্ধ্যার সময় একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কোথায় আশ্রয় পাব ভাবছি আর একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছি এমন সময় একটা প্রাসাদ তুল্য বাটীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে পড়লাম। তখন মনে করলাম আজ এঁদের বাড়ীতেই আশ্রয় নিতে হবে।

আমি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলাম বৈঠকখানায় আলো জলছে। একজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এটা কায়স্থের বাড়ী। ইঁহারাই এই গ্রামের জমিদার কিন্তু এখানে থাকা চলবে না। বাবু অতিথিকে থাকতে দেন না।"

কুমুদ কহিল "বলেন কি দাদামশায়, সেকালে এমন লোক ছিল যে অতিথিকে বিমুখ করত ?" সার্ব্বভৌম, "ভায়া সেকাল আর একাল বলে কোন কথা আছে কি ? চিরকালই ভাল মন্দ লোক আছে। সাধারণের বিশ্বাস সত্যযুগে কেহই পাপ করত না কিন্তু পুরাণ গুলো উল্টে দেখলে বুঝতে পারবে, চিরকালই পাপ পুণ্য আছে।"

"সেকথা ঠিক দাদামশায়, আমারও তাই বিশ্বাস। তারপর কি হল ?"

"তারপর আমি সট্‌করে বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করলাম। দেখলাম একটী অর্দ্ধপক্ক কেশবিশিষ্ট বাবু বসে তামাক সেবন করছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করতেই তিনি আমার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কে রে ? বলা নেই কহা নেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করলি যে ?"

আমি উত্তর করলাম—"বাবু, আমি ব্রাহ্মণ, আজ আপনার বাড়ীতে অতিথি।"

বাবু বললেন, "এখানে অতিথ ফকিরের স্থান হবে না। অনেক গাছতলা আছে থাকগে।"

আমি উত্তর করলাম, "গাছতলায় কি করে থাকব? সেখানে বাঘে শিয়ালে আমাকে নিয়ে যদি ভোজ লাগিয়ে দেয় তবে আপনাকেই ব্রহ্মহত্যার জন্ম পাপের ফলভাগী হতে হবে।"

বাবু বললেন, "সে ভাবনা তোমার কিসে?"

আমি উত্তর করলাম, 'ভাবতে হয় বই কি বাবু,—'সম্বন্ধ মাভাষণপূর্ব্বমাহু' আপনার সঙ্গে যখন কথা বলছি, তখন আপনার সঙ্গে ত সম্বন্ধ হয়েছে। অতএব আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি আমার দৃষ্টি রাখা উচিত?"

বাবু বললেন—"ছোঁড়া ডেঁপো ত কম নয়। অমন অং বং অনেক শুনেছি। আজকাল বটতলার ছাপা বই হয়ে মুচি-মুদ্দফরাসেও অং বং করতে শিখেছে।"

এইবলে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোর বাড়ী কোথায় বল দেখি?"

আমি উত্তর করলাম—"আমার বাড়ী পাটপাড়া গ্রামে।"

এই কথা শুনে তিনি বললেন, "তুই কক্ষণ বামুন ন'স্। তুই নিশ্চয়ই নমঃশূদ্র। আমার বাড়ীতে ডাকাতি করতে এসেছিস্। বামুন হলে পড়াশুনা ছেড়ে ভিক্ষে করতে আসবি কেন?"

আমি উত্তর দিলাম—"আমি ত ভিক্ষে করতে আসি নি। এই গ্রামে এসে রাত্রি হয়ে গেল তাই আপনার বাড়ীতে অতিথি হয়েছি।"

বাবু বললেন "তুই ভিক্ষে করতে যে আসিস নি তা আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি। এখন তোর মুখে প্রকৃত কথাই বেরিয়ে পড়ল। আমার কাছে কি চালাকি করা খাটে? আমরা উকিলকে যে জেরা করতে বলে দিই, তাতে নামজাদা পেশাদার সাক্ষীদের মাথা পর্য্যন্ত গুলিয়ে যায়, তা তুই ত একটা বালক মাত্র।"

আমি, "হাঁ মশায়, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলেই আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি।"

বাবু, "বলিস কি [illegible] তুইও ত তবে কম বুদ্ধিমান নস? তা হবে বই কি—ডাকাতি করা কি আর নির্ব্বোধের কাজ। তা বেশত এখন বুঝলি [illegible] আমার কাছে কোন চালাকি খাটবে না। এখন শান্তশিষ্ট ছেলের [illegible] বল দেখি তোমার সম্প্রদায় কোথা রেখে এসেছ? [illegible] আমাদের [illegible] মধ্যেই [illegible] কেমন [illegible] চুপ করে রহিলাম। তখন [illegible] বললেন, "কি, তুই বলবিনে? আচ্ছা তোকে [illegible]" এই কথা বলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়[illegible] আমি দেখলাম তিনি কাঁপতে আরম্ভ করেছেন। [illegible] স্বরে "রামসিং রামসিং" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। তখন একজন ভোজপুরী বরকন্দাজ ত্রস্তভাবে [illegible] উপস্থিত হল। তখন বাবু তাকে বললেন, "রামসিং, [illegible] রাতমে তোম লোক খুব সাবধানমে

থেক, আর বন্দুকমে গুলি ভরকে রেখ। আজ নিশ্চয় ডাকাত পড়েগা। ডাকাত সব আমবাগানমে হ্যায়।”

আমি বললাম, “আপনি বৃথা ভয় করছেন। আমি প্রকৃতই ব্রাহ্মণ, ডাকাত নই।” রামসিং উপস্থিত হলে বাবুর সাহস ফিরে এল। তখন তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হলেন ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন “সত্য করকে কহ, ডাকাত ন'স কি?” আমাকে আর উত্তর দিতে হল না। রামসিং বলল “নেহি হুজুর, এ কোন ডাকু নেহি হোগা।” তখন তিনি একটু চিন্তা করে বললেন “রামসিং আজ রাত্রিমে সব হুঁশিয়ার হোকে থাকবে।” রামসিং উত্তর করল, “যে হুকুম হুজুরকা।” এই কথা বলে সে চলে গেল।

ঐ সময়ে আমাদের গ্রামে বুন্দুরাম সর্দারের ডাকাতের দলের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐ কারণে বাবুর ঐরূপ আশঙ্কা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। যাহা হউক বাবুর সন্দেহ কিন্তু একেবারে গেল না। তিনি বার'বার আমাকে অন্যত্র যেতে বললেন। কিন্তু আমি তখন কোথায় যাব, কাজেই কিছুতেই উঠলাম না। বাবু কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি আমাকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান কিছুই প্রদর্শন করলেন না, আমি অনেকক্ষণ উপবিষ্ট রহিলাম। তিনি ক্রমাগত ধূমপান করতে লাগলেন। চাকরে মধ্যে মধ্যে কলিকাটি পরিবর্তন করে দিয়ে যেতে লাগল। আমি সারাদিন তামাক সেবন করি নি। তিনি যে তামাক

সেবন করছিলেন, তা অতি চমৎকার ছিল। উহার সুমধুর গন্ধে বৈঠকখানা ঘরটি আমোদিত হচ্ছিল। ধূম পান করার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হল। আমি আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করে আলবোলা হতে কলিকাটি উঠিয়ে নিলাম। বাবু তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করে বল্লেন—"বেটা, তুই কক্ষণ বামুন ন'স। তুই নিশ্চয়ই নমঃশূদ্র ও ডাকাত, নইলে আমার আলবোলা থেকে কল্কে উঠাতে সাহস করে এমন লোক কে আছে?" এই কথা বলে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন ও "রামসিং রামসিং" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। সে তাঁর চিৎকার শুনে তৎক্ষণাৎ ছুটে এল। তখন বাবু বললেন, "রামসিং, এ আদমী নিশ্চয়ই ডাকাত; হামারা আল্‌বোলাসে কলিকা উঠ লিয়া। আজ রাতমে নিশ্চয় ডাকাতি করেগা।"

রামসিং বলল—"হুজুর, এ লেড়কা আদমী কেয়া করেগা? আপ্ কাহাকো ডরতে হেঁ?"

বাবু বললেন, "রামসিং, তুমি ইস্‌কো লেড়কা দেখছ, এর সঙ্গে যে বহুত ডাকু লুকায়ে হ্যায় তাত তম্ ভাবছ না।"

রামসিং। "কুছপরোয়া নেহি, হুজুর, হাম একা পাচ ছ আদমীকো ভাগানে সক্তা হ্যায়। ডাকু লোগকো আনে দিজিয়ে। হাম শালা লোগকো দেখ লেঙ্গে।

বাবু। "না রামসিং, তোম ঘুমায়ে রবে, আর এ আদমী

দরজা খুলে দেবে। যখন তারা ভিতরমে এসে পড়বে, তখন তোম্ কেয়া করবে? আবি একে নিকাল দেও।"

তখন আমার বড়ই ক্রোধ হয়ে পড়ল। মনে করলাম, এই পাষণ্ডের বাটীতে অবস্থান করা কখনই উচিত নয়। ইহা অপেক্ষা গাছতলা শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমি বললাম—"পাষণ্ড, ব্রাহ্মণকে অপমান করা, এই আমি চললাম। তুই যাতে উচ্ছন্ন যাস, তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।" এই কথা বলে যজ্ঞোপবীত বার করে ছিন্ন করতে উদ্যত হলাম। তখন তিনি এসে আমার পদধারণ করে বল্লেন "ঠাকুর, আমাকে ক্ষমা করুন।" আমি বার বার তাঁহাকে আমার পদ পরিত্যাগ করতে বললাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। আমি বুঝলাম লোকটি কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে অতিথির প্রতি বিরূপ। যাহা হউক তাঁহার কাতরতা দেখে আমি শেষে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলাম। সেই ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হতে লাগল। সে সময়ে ধনীগণ কিরূপ উদ্বেগে কাল যাপন করতেন ইহা হতে অনেকটা অনুমান করা যায়। তুমি ত ভাই ডাকাতদের অত্যাচার দেখ নি। তখন এই দেশটা এক রকম ডাকাতের রাজত্বই ছিল। ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এদেশের রাজা হয়েছিলেন, তাই আমরা এখন রাম-রাজত্বে বাস করছি।"

কুমুদ। "দাদামশায়, এই অরাজকতা কি আমাদের দেশে চিরকালই ছিল?"

"একি বিনয় তোমার হাতে লোহা কেন ?"

শিল্পী—ধীরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, মহাশয়ের সৌজন্যে।

NANDAN PRESS, CALCUTTA.

সার্ব্বভৌম। "তা ছিল বই কি ভায়া, অবশ্য সত্য যুগের কথা বলছিনে।"

কুমুদ। "না দাদামশায়, চোর ডাকাত চিরকালই আছে "

সার্ব্বভৌম। "না ভায়া, সত্য ত্রেতায় কি কখন চোর ডাকাত থাকতে পারে ?"

কুমুদ। "দাদামশায় যখন রাজ্যশাসন প্রথা হয়েছিল তখনই চোর-ডাকাতের আবির্ভাব হয়েছিল ?"

সার্ব্বভৌম। "না ভায়া, সত্য ত্রেতায় চোর ডাকাত থাকবে কেন ? এই কলিকালেই যত চোর-ডাকাতের আবির্ভাব হয়েছে।"

কুমুদ। "না দাদামশায়, কলিকালেও যে এদেশে চোর ডাকাত ছিল না, তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি বললেন,—সত্য-ত্রেতায় চোর ডাকাত ছিল না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি মহর্ষি বাল্মিকী, যিনি রত্নাকর নামে ডাকাত ছিলেন তিনি কোন্ কালের লোক ?"

সার্ব্বভৌম। "হাঁ ভায়া, তুমি ঠিক বলেছ। আমার বোধ হয় ঐ সময় থেকেই চোর ডাকাতের সৃষ্টি হয়েছে।"

কুমুদ। "না দাদামশায়, চোর-ডাকাত চিরকালই আছে। যখন যখন রাজশক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, সেই সেই সময়েই চোর-ডাকাতের আবির্ভাব হয়েছিল। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এই কলিকালেও এদেশে চোর-ডাকাত বড় ছিল না। বেশি দিনের কথা নয়, গত বৌদ্ধ আমলে চীন পরিব্রাজক হিয়েন্‌সাং ও ফাহিয়ান

২

দূত ম্যাগাস্থিনিস্ ভারত সম্বন্ধে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তা দেখে জানা যায় যে সে সময়ে চোর ডাকাত ছিল না।"

সার্ব্বভৌম। "সত্য নাকি ভায়া? বৌদ্ধদের আমলেও এমন ছিল? তা এ চোর ডাকাত হ'ল কোন সময় থেকে?"

কুমুদ। "দাদামশায়, চোর-ডাকাত চিরকালই আছে। রাজ-শক্তি দুর্ব্বল হলেই তাদের আবির্ভাব প্রবল হয়ে থাকে। তবে সেকালে তাদের সংখ্যা কম ছিল। হিন্দুধর্ম্মের পতনই এই চোর-ডাকাতের আবির্ভাবের প্রধান কারণ। যখন মুসলমানগণ এই দেশ জয় করলেন, তখন ধর্ম্মের একটা সংযম উচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাহারা অজ্ঞ তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান হয়ে পড়ল। কাজেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা বিদ্বেষ ভাব চলতে লাগল। মুসলমান হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে লাগল ও হিন্দু মুসলমানের সম্পত্তি লুণ্ঠন আরম্ভ করে দিল। সে সময়ে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ বিগ্রহ হতে আরম্ভ হল, কাজেই দেশে একটা স্থায়ী অরাজকতা রয়ে গেল। শেষে মোগল সাম্রাজ্যের পতনে অরাজকতার বৃদ্ধি হল। তার পর ইউরোপীয় শক্তির সহিত দেশীয় রাজন্যবর্গের কলহ হল। শেষে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ দেশের মালিক হয়ে পড়লেন। তাঁদেরও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় লেগেছিল। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তখনও ইংরাজ দেশে ঠিক সুশাসন আনতে পারে নি।"

"হাঁ ভায়া, তোমার কথা আমার ঠিক মনে লাগছে। এ কথা

আমি স্বীকার করি যে প্রবল দুর্ব্বলের উপর চিরকালই অত্যাচার করে আস্‌ছে ; চিরকালই এই দেখা যায়। রাজাদের দিগ্বিজয়ও ডাকাতি বই আর কি বলা যেতে পারে।"

"হাঁ দাদামশায়, তার পর আপনি কি কর্‌লেন তাই বলুন।"

"হাঁ ভায়া, সেই ভদ্রলোকের কাতরতা দেখে আমার আর কিছুমাত্র ক্রোধ রইল না। কিন্তু সে বাড়ীতে অবস্থান করারও প্রবৃত্তি হল না! তখন কলিকাটি পুনরায় আলবোলার উপর বসিয়ে দিয়ে গাত্রোত্থান করলাম। আমাকে চলে যেতে দেখে বাবুটি বল্‌লেন—"ঠাকুরমশায় কোথায় যান?" আমি উত্তর করলাম—"কোথায় আর যাব? গাছতলাতেই যাই।" তখন তিনি পুনরায় পদধারণ করে ক্ষমা চাইলেন। তখন তাঁর অনুরোধ আর উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না।" কুমুদ কহিল— "দাদামশায়, বাবুটি ত ভারি মজার লোক? তার পর কি হল?"

সার্ব্বভৌম,—"ভায়া তার পর যে কি হল, এটা কি আর তোমাকে বল্‌তে হবে? তার পর শুধুর আদর—চর্ব্ব্য-চূষ্য লেহ্য-পেয়—কত আর বল্‌ব?"

"বড় মজা হয়েছিল ত?"

"মজা বলে মজা! পরদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দেখি বাবু দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে প্রণাম করে দুটো টাকা প্রণামী দিলেন।"

আমি বল্‌লাম- "প্রণামী আবার কেন?" তিনি বল্‌লেন—

"আপনি আমার বাড়ী পদধূলি দিয়েছেন, প্রণামী না দিলে হবে কেন।"

"আপনি কি করলেন?"

আমি বললাম—"প্রণামীর আবশ্যক নেই, তবে আপনি অতিথির প্রতি ভবিষ্যতে বিরূপ হবেন না।" আর অতিথি বিমুখ হলে যে প্রত্যবায় হয় তা তাঁকে শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা বিষদভাবে বুঝিয়ে দিলাম। তিনি বললেন "আমার পিতা খুব আতিথেয় ছিলেন। একদিন একজন অতিথি এসে শেষ রাত্রিতে দল বল এনে আমার পিতাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তখন নিতান্ত শিশু। সেজন্য অতিথির নাম শুনলেই আমার কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হয়।"

আমি বলিলাম "দেখুন সকলেই যে অসাধু এরূপ মনে করবার কারণ নেই। আপনি সতর্ক হয়েই অতিথি সৎকার করবেন।"

তিনি বললেন—"কাল আমার বেশ শিক্ষা হয়েছে। আপনার মত পণ্ডিতকেও আমি ডাকাত বলে মনে করেছিলাম। এখন আপনার উপদেশ মতই কাজ করব।"

কুমুদ—"তার পর কোথায় গেলেন?"

সার্ব্বভৌম—"তার পর মনে করলাম কলিকাতায় যাই ও সেখান হতে কাশীধাম রওনা হব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"দাদামশায়, আপনার কলিকাতা যাওয়ার পথে আর কোন বিশেষ ঘটনা কি ঘটেছিল তাই আমাকে বলুন?" কুমুদ সার্ব্বভৌম মহাশয়কে প্রশ্ন করিল। "ভায়া, রাস্তায় আর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নি। তবে কলিকাতায় উপস্থিত হয়ে যাহা যাহা ঘটেছিল তাই তোমাকে বলছি শুন।—

কলিকাতায় এসে শুনলাম জজপণ্ডিতের পদ খালি আছে। মনে করলাম—দেশে দেশে বেড়িয়ে আর কি হবে; জজ পণ্ডিতের কাজ যদি পাই ত করি। আমি যে ভদ্রলোকের আশ্রয় নিয়েছিলাম তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন ও সহায়তা করতে চাইলেন। তাঁর একটা দরখাস্ত করে দিলাম। জজসাহেব আমাকে সাক্ষাৎ করতে লিখলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি যখন তাঁর এজলাসে গিয়ে হাজির হলাম, তখন তিনি একটা খুনী মোকদ্দমার বিচার করছিলেন। মোকদ্দমার আসামী একজন পোদ। একটা জমি নিয়ে দাঙ্গা হয়েছিল।

এই দাঙ্গায় বুলু নামে একজন পোদ অপর পক্ষের একজনকে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করায় সে খুন হয়েছিল। বুলু একজন দুর্দ্দান্ত লোক ও তার অবস্থাও খুব ভাল ছিল। সেজন্য কেহই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে সাহসী হয় নি। কাজেই মোকদ্দমার ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু জজসাহেবের বিশ্বাস হয়েছিল যে বুলু নিশ্চয়ই খুন করেছে। তাই জজসাহেব তার বিপক্ষ দলের কয়েকটা সাক্ষীর জবানবন্দী নিয়ে বুলু ও তার সঙ্গী-গণের বিরুদ্ধে চার্জ্জ ফ্রেম করে বললেন—তোমাদের বিরুদ্ধে প্রাণ নাশক অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গা করার ও সর্দ্দারকে খুন করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ও তাদের কি বলার আছে বলতে বললেন। তখন বুলু উত্তর দিল—যে তারা যে খুন করেছে তা তিনি কি করে ঠিক করলেন। সে নিজে ফরিয়াদী পক্ষকে জেরা করতে চাইল এবং জজ সাহেবও আদেশ দিলেন। বুলুর উকিল ইসারা করে তাকে নিষেধ করলেন। বুলুর ভ্রাতুষ্পুত্র মৃদুস্বরে বলল যে উকিল নিষেধ করছেন, তখন জেরা করে কাজ নেই। বুলু বলল—উকিল মোকর্দ্দমার কি বুঝেছে? তার ফি ত সে পেয়েছে সে এখন বসে দেখুক। দেখ আমি জেরা করে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে সে ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করল—"আমাকে তুই জানিস?"

ফরিয়াদি উত্তর দিল "হাঁ জানি।"

"আমার ভাইপো যোগীন্দকে চিনিস?"

"হাঁ চিনি।"

"আমি হাঁক্ দিলে হাজার লোক জড় হতে পারে তা জানিস্?"

"হাঁ তা জানি বই কি।"

"যোগীন্দ লাঠি ধর্‌লে তোর মত পাঁচশ ত্রিশ জনকে ভাগিয়ে দিতে পারে তা জানিস্?"

"হাঁ জানি।"

"তবে, আমি নিজে যাব লাঠি ধর্‌তে? দেখুন হুজুর, আমার মত লোক যাবে নিজে লাঠি ধর্‌তে। ফরিয়াদীর কথা কত দূর সত্য তাই বিবেচনা করে দেখুন।"

জজ সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"তোমার ভাইপো লাঠিখেলা শিখেছে কার কাছে?"

বুলু—"হুজুর, কার কাছে আর শিখ্‌বে? ও-দিগরের লোক আমার কাছে লাঠি খেলা শেখে, আর আমার ভাইপো যাবে অন্যের কাছে লাঠি খেলা শিখ্‌তে; তেমন খেলোয়াড়ই বা কে আছে?

"তোমার ভাইপো কি তোমার চেয়েও ভাল খেলোয়াড় হয়েছে?"

"হুজুর, ও ছেলে মানুষ, আমার কাছে কি আর লাঠি ধর্‌তে পারে?"

"ঐ জমি নিয়ে কাজিয়া কেন হয়েছিল বল্‌তে পার?"

"হুজুর, ঐ জমিখানা আমার, ঐ বেটাদের কত দূর স্পর্দ্ধা দেখুন। ঐ জমি বেটারা জোর করে চষ্‌বেই।"

"তোমার মত মাতব্বরের জমি ওরা চষ্‌তে এসেছিল কোন সাহসে?"

"দলে পুরু হয়ে এসেছিল। নিতাই সর্দ্দার একটু খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল কিনা—তাই একটু অহঙ্কারও হয়েছিল।"

"বেটার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল নিশ্চয়, নইলে তোমার জমিতে আসে চাষ দিতে?"

"সে আর বল্‌তে হুজুর।"

"তুমি তখন কি কর্‌লে?"

"কি আর কর্‌ব? তাকে বারণ কর্‌লাম, তা সে কিছুতেই শুনল না. বল্‌ল, যদি বাধা দিস্‌ত তোকে খুন করব। বলুন দেখি, হুজুর, আমার জমি আমি কি করে ছেড়ে দিয়ে যাই?"

"তা তুমি যাবে কেন? নিজ সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকার সকলেরই আছে।"

"সেই জন্যেই ত যাইনি, হুজুর।"

"তা বল্লম বসিয়ে দিলে কেন?"

"এত আস্পর্দ্ধা কি সহা যায়? আত্মরক্ষাও ত করতে আমার অধিকার আছে, হুজুর।"

এই কথা শুনে জজ একেবারে বুলুর ফাঁসির হুকুম দিয়ে বস্‌লেন। আর তার সঙ্গীদের দুই তিন বৎসর করে জেল দিলেন।

কুমুদ—"দাদামশায়, তাকে ফাঁসির হুকুমটা দেওয়া অন্যায় কি হয়েছিল?"

সার্ব্বভৌম—"ভায়া, তুমি যদি বুলুর কান্না শুনতে তবে আর ও কথা বলতে না। তার কান্না দেখে আমারও কান্না পেতে লাগল। আমি আর সেখানে অবস্থানই করতে পারলাম না। কিন্তু জজসাহেবের মোটেই দয়া হল না।"

"দয়া করলে কি বিচার করা চলে দাদামশায়?"

"তা বটে ভায়া, কিন্তু পুলিশের লোকগুলোই বা কি নিষ্ঠুর। তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। আমি এজলাসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বুলুকে দেখে বললাম,—"বাপু কেন তুমি নিজে জেরা করতে গেলে?"

তার ভাইপো বলল—"কাকার বুদ্ধির দোষেই ত সাজা হয়ে গেল।"

বুলু তখন বলল,—"হাঁ ঐ হাঁদা জজের রায় বাহাল থাকবে কিনা? কালই আপিল করে দেব।"

কুমুদ—"দেখলেন দাদামশায়, বুলুর কি রকম তেজ। ও-রকম লোকের ফাঁসি হওয়াই উচিত।"

সার্ব্বভৌম, "হাঁ ভায়া তা বটে কিন্তু খুনীদের মেরে ফেললে, তাদের কি আর শাস্তি হল? নশ্বর দেহের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী—

"যাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ..."

"তা বটে দাদামশায়, তাই বলে কে মরতে চায় বলুন।"

"সে কথা সত্য ভায়া, কিন্তু জীবের মরা বাঁচা কিছুই নয়। কেবল বেঁচে থাকলে ত কিছু লাভ নেই। নৈতিক উন্নতি না হলে চিত্তশুদ্ধি কি করে হবে? আর চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভই বা কি করে হবে? রাজার কর্ত্তব্য হওয়া উচিত অপরাধীদের নৈতিক উন্নতি করে দেওয়া। অপ-রাধীদের জেলে রেখে দিয়ে নীতি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যাতে তাদের চরিত্র সংশোধিত হয় ও সুশিক্ষা পায়, তাই রাজার করা উচিত। তা না করে রাজারা করেন কি? যাতে তারা জাহান্নমে যায় তারই ব্যবস্থা করেন।"

"কি করে রাজা তাদের সংশোধন করবেন?"

"কেন? তাদের আপন আপন ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি বুঝিয়ে দিলে, কোন অপরাধে কিরূপ পাপ হয় ও যমরাজার কাছে কিরূপ শাস্তি হয় সেগুলি তাদের জানিয়ে দিলে ও ধর্ম্মের মূল বিষয়গুলি তাদের বুঝিয়ে দিলে, তাদের নৈতিক উন্নতি হয় না কি? কিন্তু তারা ত সুশিক্ষা পায়ই না পরন্তু যত চোর-ডাকাত ও খুনের সঙ্গে থেকে থেকে তারা অধিকতর হীন চরিত্র হয়ে পড়ে।"

"কি করে রাজা ওরূপ শিক্ষা দেবেন?"

"কেন? শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করলেই পারেন। তা ছাড়া অনেকে পেটের দায়েও অকার্য্য কুকার্য্য

করে থাকে। রাজা যদি জেলের মধ্যে তাদের লাভজনক শিল্প কার্য্যের শিক্ষা দেন তবে তারা জেল থেকে বেরিয়ে এসে সেই সকল কার্য্যের দ্বারা অনায়াসে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে। তা হলে আর তারা চুরি ডাকাতি করে না।"

"দাদামশায়, আপনি ঠিক বলেছেন। তবে দেশের নেতারাও বা সে সম্বন্ধে চেষ্টা করেন কই? এখন আপনার জজপণ্ডিতির কি হল তাই বলুন শুনি?"

"কি আর বলব ভায়া, আমি জজ-সাহেবের সঙ্গে আর দেখাই করিনি।"

"বলেন কি? এমন চাকরীটা আপনি হেলায় ছেড়ে দিলেন?"

"ছেড়ে না দিয়ে আর কি করা যেত বল? ওরূপ নিষ্ঠুর জজের অধীনে কি কাজ করতে বল, ভায়া?"

"দয়া করলে কি বিচার করা যায়? সে যখন খুন করেছিল, তখন কি সে কোন দয়া করেছিল?"

"তা বটে; কিন্তু আমাদের মত দুর্ব্বল চিত্ত লোকের কি বিচারাসনে বসা চলে? তাই ঐ পথে আর পদক্ষেপ করতে ইচ্ছা হল না। ভাল করিনি, ভায়া?

"বেশ করেছিলেন। তার পর কি করলেন?"

"তার পর তীর্থ পর্য্যটনে বেরিয়ে পড়লাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"পদব্রজে তীর্থ পর্য্যটন করব অভিপ্রায় করলাম। চার পাঁচ দিন ভ্রমণ করার পর বর্দ্ধমান অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। ক্রমে শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কোন দিন অর্দ্ধাহারে কোন দিন অনাহারে কাটতে লাগল। ক্রমে শরীরও অবসন্ন হয়ে পড়ল। এমন সময়ে একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। শুনলাম—সেখানকার ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ীতে একটা ধূমধামের শ্রাদ্ধ আছে। মনে করলাম—আজ উত্তম রূপে আহারটা করা যাউক। তাই একটা স্বচ্ছ পুষ্করিণীতে স্নানাহ্নিক সমাপন করে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম তথায় বহুলোকের সমাগম হয়েছে। দানসাগর শ্রাদ্ধ, বড় বড় পণ্ডিতের সভা বসেছে। আমি সেখানে একজন অপাংক্তেয় বইত নয়, কাজেই সেখানে বসে দেখতে লাগলাম। বেলা তৃতীয় প্রহরে ব্রাহ্মণ ভোজন, তাহারই অপেক্ষায় রইলাম। ক্রমে বেলা অপরাহ্ন হয়ে পড়ল। আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লাম।

এমন সময় ব্রাহ্মণদের ডাক পড়্‌ল। আমিও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উঠে পড়্‌লাম। বহির্ব্বাটীর পশ্চাদ্ভাগে যে মহল ছিল, তার প্রাঙ্গনে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম—ব্রাহ্মণ সংখ্যায় যত ছিল তার চতুর্থাংশের উপযুক্ত পাতা করা হয়েছে। এক একখানি পলাশের পাতার উপর অতি কদর্য্য তরকারী অতি সামান্য পরিমাণে দেওয়া আছে। পাতার সংখ্যা অল্প দেখে মনে কর্‌লাম শেষে স্থান পাই কিনা, তাই তাড়াতাড়ি একখানি পাতা দখল করে বসে পড়্‌লাম। কিন্তু অপর ব্রাহ্মণরা কেহই বস্‌লেন না; তাঁরা সকলেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময়ে এক চাঙ্গারী লুচি এসে হাজির হল। অমনি ব্রাহ্মণের দল গিয়ে কোঁচড় পেতে পরিবেষ্টাকে ঘিরে দাঁড়ালেন। পরিবেষ্টা প্রত্যেকের কোঁচড়ে চারিখানি করে লুচি ফেলে দিতে লাগ্‌ল। ক্রমে যত পরিবেষ্টা এল—ব্রাহ্মণগণ গিয়ে তাকে বেষ্টন করে ধর্‌তে আরম্ভ করে দিল। দেখ্‌লাম ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি অধিক বলশালী তিনিই অধিক লুচি সংগ্রহ কর্‌তে লাগ্‌লেন। যারা দুর্ব্বল ছিলেন তাঁরা ঝগ্‌ড়া আরম্ভ করে দিলেন। ক্রমে ঠেলাঠেলি,—তার পর গালাগালিও চল্‌তে লাগ্‌ল। শেষে হাতাহাতি এবং চড়চাপড়ও চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি অবাক্ হয়ে সেই ব্রাহ্মণদের কাণ্ড দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। সে ব্যাপার যদি তুমি দেখ্‌তে ত বুঝ্‌তে পার্‌তে কিরূপ বীভৎস ব্যাপার সে হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা লুচির চ্যাঙ্গারী গুলি পরিবেষ্টার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে লাগ্‌লেন। পরস্পর

কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে লুচি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার পর মিঠাইয়ের হাঁড়ী এসে উপস্থিত হল। তখন ব্রাহ্মণগণ পুনরায় হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে দিলেন। যতগুলি মিষ্টান্নের হাঁড়ী আসল—সকল গুলিই কাড়াকাড়িতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।”

“কুমুদ– “দাদামশায়, ভারি রগড়ের ব্রাহ্মণ ভোজন হল ত ?”

সার্ব্বভৌম—“হাঁ ভায়া, ব্রাহ্মণ ভোজন ত শেষ হল, কিন্তু আমার অবস্থাটা কিরূপ হয়েছিল তা তুমি সহজেই বুঝতে পারছ। কোথায় পরিতোষ করে আহার করব মনে করে এসেছিলাম, শেষে উপবাসের ব্যবস্থাই হয়ে পড়ল। অন্যত্র গেলে দুটো শাক অন্ন ত জুটতই। ব্রাহ্মণরা ধূলি মেখে এক এক পোঁটলা লুচি নিয়ে সরে পড়তে লাগলেন। তখন বুঝলাম সেখানকার ব্রাহ্মণ ভোজনটা এইরূপ হয়ে থাকে

কুমুদ—“তা আপনার বোধ হয় সেদিন উপবাসীই থাকতে হল ?”

“না ভায়া, তা আর হ’ল না। ব্রাহ্মণদের মারামারি থামাবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে একজন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। আমি যখন উঠে চলে যাবার উপক্রম করছিলাম তখন তিনি আমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে পরিচয় দিলে, তিনি আমাকে সমাদর করে ভিতরে নিয়ে গেলেন ও খুব যত্ন করে ভোজন করালেন। আমি দেখলাম—আহারাদির ব্যবস্থা জমিদারের যোগ্যই হয়েছিল।

ক্ষীর ছানা ও নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্নের ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছিল। প্রায় হাজার লোক ভোজন করল। তখন ব্রাহ্মণদের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হতে লাগল! আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনাদের এত জোগাড় দেখছি—কিন্তু ব্রাহ্মণদের ভোজনের ব্যবস্থা ওরূপ কেন? তাঁরা উত্তর দিলেন—যে ব্রাহ্মণদের জন্য কোন সুব্যবস্থার উপায় নেই। তাঁরা নিয়ে যেতেই চান। বসে খেতে চান না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মণদের ঐরূপ স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা যায় নি।"

কুমুদ—"দাদামশায়, ব্রাহ্মণদের শিক্ষার অভাবেই এইরূপ নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁদের যদি একটুও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকত তবে কি তাঁরা এই অকিঞ্চিতকর লুচির জন্য এরূপ নীচতা প্রকাশ করতে পারতেন? ব্রাহ্মণ ত্যাগের জন্যই বড় হয়েছিলেন। আর এই লোভের জন্যই এখন ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়েছেন। আহারাদি করতে ত দেখছি আপনার বেলা শেষ হয়ে গেল। তারপর কোথায় গেলেন?"

"কোথায় আর যাব? সেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন রাত্রিতে কোথায় যাবেন? পণ্ডিতদের বাসায় অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমিও মনে করছিলাম কোথায় যাই, কাজেই তাঁর ব্যবস্থাই স্বীকার করলাম। পরদিন প্রাতে পণ্ডিতদের বিদায় করা হ'ল। আমাকেও তাঁরা একটা ঘড়া ও পাঁচটি টাকা দিলেন। আমি টাকা পাঁচটি গ্রহণ করলাম, ঘড়াটি ফেরত দিয়ে

বল্‌লাম—আমি তীর্থপর্য্যটনে যাব, সেজন্য পথের খরচের নিমিত্ত টাকা কয়টি নিলাম। তাঁরা আমাকে আপ্যায়িত করে বিদায় দিলেন। কএকদিন পদব্রজে এসে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল; আমি বুঝ্‌লাম—পদব্রজে তীর্থপর্য্যটন করা আমার শরীরে আর সহ্য হবে না, তাই রেলগাড়িতে উঠে পড়্‌লাম। তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলকোম্পানীর কর্ডলাইন প্রস্তুত হয় নি। আমি কহলগাঁয়ের টিকিট নিয়ে ঐ-স্থানে উপস্থিত হ'লাম।
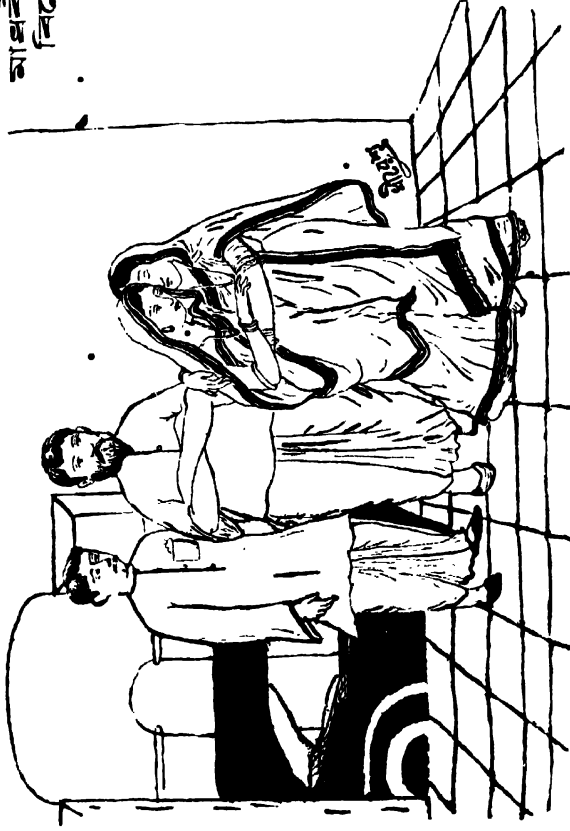
উভয়ের বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল

NANDAN PRESS CALCUTTA

শিল্পী—ধীরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী এম. এ, মহাশয়ের সৌজন্যে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"কহলগাঁ স্থানটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ঐ স্থানটি ব্যবসার একটি কেন্দ্র। বড় বড় মহাজনের গদি ঐ-স্থানে আছে জেনে মনে করলাম এখানে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করা যাক্। পথে এসে শুনলাম মধুসূদন দত্ত একজন ধনী ব্যবসাদার। তাঁহার কএক স্থানে আড়ত আছে ও লোকটাও খুব সদাশয়। আমি প্রথমেই মধু বাবুর আড়তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ও আমার প্রার্থনা জানালাম। তিনি আমাকে দেখে বল্লেন—"ঠাকুর তুমি ছেলেমানুষ কাশী কি জন্য যাচ্ছ?" আমি উত্তর করলাম—"কেবল মাত্র কাশীতে যাব না; তীর্থপর্য্যটন করাই আমার উদ্দেশ্য।" তিনি বল্লেন—"তোমার কি তীর্থপর্য্যটন করার বয়স গিয়েছে।" আমি উত্তর দিলাম,—"আমার মা মারা গিয়েছেন, সংসার আমার পক্ষে শূন্যময়, তাই যাচ্ছি।" তিনি বল্লেন—"ঠাকুর লেখাপড়া কিছু শিখেছ?" আমি উত্তর দিলাম—"কাব্য ও স্মৃতি শাস্ত্রটা আমার পড়া আছে।"

"বলেন কি ঠাকুর, আপনি এতবড় পণ্ডিত?"—এই বলে গড়

হয়ে প্রণাম করলেন ও পায়ের ধূলা নিলেন এবং বললেন—"ঠাকুর মশায়, আপনি ছেলেমানুষ—আমি বুঝতে পারছি আপনি মনের দুঃখে সংসার ত্যাগী হয়েছেন। আপনি আমার কাছে থাকুন। আমি সাধ্যমত আপনার যাতে উন্নতি হয় তা করব। আমিও এক সময়ে নিরাশ্রয় হয়ে আপনার মত বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমারও আপনার বলতে কেউ ছিলনা। আমি আপনার লোক না থাকার বেদনা বুঝি।' এই কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। তখন আমি মনে করলাম এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান আমার সহ্য হবে না। এরূপ একজন মহানুভবের আশ্রয় যখন পাচ্ছি তখন ইহা ত্যাগ করা উচিত নয়। দত্তমহাশয়ের প্রস্তাব মত তাঁর নিকট অবস্থান করতে স্বীকৃত হলাম। তাঁর নিকট মাস দুই অবস্থান করার পর একদিন তিনি আমাকে বললেন—"ঠাকুরমশায়, আমি আমার কলিকাতার আড়তে যাব। আমাকে অনেক সময় সেখানকার আড়তেই থাকতে হয়। সেই সময়ে আমার এখানকার কর্ম্মচারীরা চুরি করে আমার বিশেষ ক্ষতি করে, সেজন্য এখানকার কারবারে ভালরূপ লাভ করতে পারিনে। আমি ব্যবস্থা করে যাচ্ছি যে মাল খরিদ বিক্রয়ের সময় আপনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন ও ওজন ঠিক হ'ল কিনা দেখবেন। কোন মাল কি দরে খরিদ হল তা আমাকে লিখে জানাবেন। কেমন পারবেন তো?" আমি উত্তর করলাম "তা খুব পারব।" তখন তিনি সেইরূপ

ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। তিনি আমার জন্য আরও ব্যবস্থা করে গেলেন যে গদি হতে আমার আহারের জন্য সিধা দেওয়া হবে ও আমার হাত খরচের জন্য মাসে ১০৲ টাকা নগদ দেওয়া হবে।

কুমুদ—"দাদামশায়, আপনার আহারের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা ছিল?" সার্ব্বভৌম—"ভায়া, আহারের যা ব্যবস্থা ছিল তা একরকম রাজাদের মত বললেও অত্যুক্তি হয় না। উত্তম সুগন্ধি যুক্ত মিহি চাল, দুধ, ঘি যত খেতে পারি, ডাল লবন তৈল যাহা কিছু আবশ্যক আর একপোয়া ভাল সন্দেশ।"

"খাবার ত বড় সুবিধা দেখ্‌ছি দাদামশায়, আপনি বোধ হয় খুব মুটিয়ে গিয়েছিলেন?"

"হাঁ ভায়া, তা একটু স্থূলাকার হয়ে পড়েছিলাম বৈ কি।"

"তারপর কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে কি হল?"

"আহারের যেমন সুব্যবস্থা হল, কাজকর্ম্মের সম্বন্ধেও আমি ততোধিক মনোযোগ দিলাম। দত্তমহাশয়ের একটি পয়সাও যাতে নষ্ট না হয় তাই করতে লাগলাম। চুরি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সে বৎসর দত্তমহাশয়ের প্রচুর লাভ হয়ে পড়্‌ল। তিনি আমার উপর এত সন্তুষ্ট হলেন যে আমাকে ঐ কারবারের দুইআনা অংশ দিয়ে আমার হাতে কারবারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করলেন। আমি এক বৎসর ধরে বুঝে নিচ্ছিলাম এবং ঐ সময়ের মধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিলাম। পর বর্ষে আমার

হাতে সমস্ত ভার পড়ায় আমি প্রাণপণে পরিশ্রম করতে লাগলাম। তাহার ফলে সে বৎসর আরও অধিক লাভ হল। আমি আমার দুই আনা অংশে চার হাজার টাকা পেয়ে গেলাম।”

“আচ্ছা দাদামশায় তা আপনি এত টাকা পেয়ে কি করলেন?”

“এতদিন ত বাটীতে কোন সংবাদ দিই নি কিন্তু যখন এত টাকা পেয়ে গেলাম তখন পিতৃদেবকে কিছু না পাঠান গর্হিত কার্য্য বলে মনে হতে লাগল, তাই দু’ হাজার টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম?”

“তিনি টাকা পেয়ে কি বললেন?”

“তিনি টাকা পেয়ে আমাকে মিষ্ট কথায় অনেক বুঝিয়ে শারদীয়া পূজার সময় বাড়ী আসতে লিখলেন। এবং সে বৎসর মায়ের পূজা করবেন তাও জানালেন।”

“আপনি সে পত্রের কি উত্তর দিয়েছিলেন?”

“আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে যদি বিবাহের জন্য জেদ না করেন, তবে যেতে পারি।” তাতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে বিবাহের জন্য কোন জেদ তিনি আর করবেন না।”

“আচ্ছা আপনার সেই ধনুর্ভঙ্গ পণ ভঙ্গ হল কি করে?”

“ভায়া, কি আর বলব? তোমার ঐ ঠাকরুণদিদির দু’খানি ঢল-ঢল ছল-ছল চোখের চটুল চাউনিতে।”

“বলেন কি দাদামশায়, আমার ঠাকরুণদিদির চাউনির এত জোর?”

"তোমার ঠাকরুণদিদির চাউনির জোরে তোমার ঠাকুরদাদা ঘাল হবে না ত কি শ্যামী বামীর চাউনিতে ঘাল হবে?"

"বাঃ দাদামশায়! আপনার মত লোকেও প্রেমে পড়েছিলেন?"

"তোমরা বুঝি মনে কর—ঠাকুরদাদাগুলো চিরকালই এই রকম নীরস বুড়ই ছিল?"

"না দাদামশায়, নাতিদের কাছে কোন্‌কালে ঠাকুরদাদারা নীরস হয়ে থাকে বলুন? আমাদের—"ঠাকরুণদিদির এত গুণ—তাত জানতাম না, যে তাঁর চাউনিতে ভীষ্মেরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে পারে।"

"এখনত জান্‌লে ভায়া!"

"হাঁ তাত জান্‌লাম, কিন্তু কি করে দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল সেটা বিষদভাবে বলুন?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:•:—

"আমি এক দিন গদিতে বসে আছি এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হয়ে বল্লেন—তিনি কন্যাদায়-গ্রস্ত তাঁকে কিছু ভিক্ষা দেওয়া হোক্। জানই ত ভায়া, আমার মুনিব অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন! তাঁর গদিতে এসে কাহাকেও রিক্ত হস্তে কখনও ফিরে যেতে হয় নি। আমার উপর কিছু কিছু দান করার ক্ষমতা দেওয়া ছিল। যে যেমন ব্যক্তি বুঝে দিতে হত। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্লাম—যে তাঁর বাড়া কোথায়? তিনি যা উত্তর কর্লেন—তাতে বুঝ্লাম তিনি আমাদেরই দেশের লোক। আমি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্লাম যে আপনি এত দূর থেকে এখানে ভিক্ষা করতে এসেছেন? তাতে তিনি উত্তর কর্লেন যে তাঁর পুত্র এখানে মালবাবু হয়ে এসেছেন। এই কথা শুনে আমি বল্লাম—"আপনি মালবাবুর পিতা হয়ে ভিক্ষা করতে এসেছেন —ইহাত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা?" তিনি উত্তর কর্লেন— "কেন?"

আমি বল্লাম—"মাল বাবুদের কি টাকার অভাব আছে ?"

তিনি উত্তর কর্লেন—"সে মোটে ৩৫৲ টাকা বেতন পায় — তাতে একটা বড় সংসার তার ঘাড়ের উপর চাপান রয়েছে। সে একা আর কি কর্বে ?"

আমি বল্লাম—"আপনাকে আর মেয়ের বিবাহের জন্য ভাবতে হবে না। আপনার পুত্র যখন কহলগাঁয়ে এসেছেন—তখন আপনি দুই এক মাস পরেই বুঝ্তে পার্বেন। আমাদের মালবাবুর সঙ্গেই সর্ব্বদা কাজ কর্ম্ম কর্তে হয়। আমি যত দূর জানি তাতে কহল-গাঁয়ের মালবাবুর উপরি পাওনা মাসে তিন শত টাকার কম হবে না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর কর্লেন—"সর্ব্বনাশ! অধর্ম্মের পয়সা? আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি—যদি শাক অন্ন খেয়ে জীবন যাপন কর্তে হয় সেও ভাল, তবু যেন অধর্ম্ম করে একটি পয়সাও ঘরে আনা না হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম—"আপনার পুত্র যে উপরি পাওনা নেন না তা আপনি কি করে জান্লেন?"

তিনি উত্তর কর্লেন—"আমার কথা কি সে অবহেলা কর্তে পারে বাবা? সে আমার এমন ছেলে নয়।"

"পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস দেখে আনন্দিত হলাম। পিতার বাধ্য না হলে পিতার এরূপ অগাধ বিশ্বাস হতে পারে না। আমি কি ভাবে পিতার অবাধ্য হয়ে চলে এসেছিলাম তা আমার

মনে হল এবং অনুতাপ হতে লাগল। ব্রাহ্মণ খুব সদালাপী, তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আমার পরিচয় দিলে তিনি বললেন—"বাবা, তুমি আমাদের দেশের লোক। এই বিদেশে পড়ে আছি, তা দেশের লোকের মুখ ত দেখতে পাইনে। তা মাঝে মাঝে যদি আমাদের বাসায় যাও তবে বড়ই আনন্দিত হব! আমার ছেলেও খুব ভাল; বড়ই মিশুক, তার সঙ্গে তোমার আলাপ করে দেব।" আমি মনে করলাম মন্দ নয়!

ষ্টেশনের মালবাবুর সঙ্গে আমাদের সর্ব্বদাই কাজ কর্ম্ম করতে হয়, তখন আলাপটা করে নিতে পারলে কাজের অনেক সুবিধা হবে। আমি তাঁর বাসায় যেতে স্বীকৃত হলাম। তিনি বার বার আমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করে চলে গেলেন! যদিও তিনি উঠবার সময় ভিক্ষার কথা আর উল্লেখ করলেন না, কিন্তু আমি স্থির করলাম—নূতন মালবাবু যখন ঘুষ নেন না তখন এই উপলক্ষ্য করে কিছু মোটা রকম দিয়ে দেব।"

কুমুদ—"আচ্ছা, আপনি ত মালবাবুর সঙ্গে আলাপ করে ছিলেন, বাস্তবিক তিনি কি কোন ঘুষ নিতেন না?"

সার্ব্বভৌম—"হাঁ, ঘুষ যাকে বলে তা তিনি নিতেন না, তবে কোম্পানির ক্ষতি না করিয়ে মহাজনরা যা দিত তা তিনি নিতেন।"

কুমুদ—"দাদামশায়, তাঁদের বাড়ী গেলে তাঁরা আপনাকে কিরূপ আদর যত্ন করেছিলেন?"

"তাঁরা খুব আদর যত্ন করেছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে

সমাদর করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। বাড়ীর সকলে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতে লাগলেন যেন আমি তাঁদের খুবই আপনার লোক। মালবাবু আমাকে কণিষ্ঠের মতই ব্যবহার করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে মধ্যে মধ্যে আমার নিমন্ত্রণ হতে লাগল। সেই আত্মীয় বিবর্জিত স্থানে তাঁদের পেয়ে আমার দিন গুলো বেশ আনন্দেই কাটতে লাগল। আমি মালবাবুর মাকে মা বলে সম্বোধন করতে লাগলাম। তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতে লাগলেন। এইরূপে মাস দুই কেটে গেল। মালবাবুর অবিবাহিতা ভগিনীটিও আমাকে দাদা বলে সম্বোধন করতে লাগল। দেখলাম মেয়েটি বয়স্থা হয়ে পড়েছে। দেখতেও মন্দ নয়, গৌরাঙ্গী না হলেও আকৃতিতে যে মাধুর্য্য আছে তা অনেক মুনিরও মন টলাতে পারে। আমি মনে করলাম- টাকার অভাবে এর বিয়ে হচ্ছে না, যত টাকা লাগে তা আমি দিয়ে এর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। মোট কথা আমাকে তার মিষ্ট কথা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মনোহারিণী মূর্ত্তি তার পক্ষপাতী করেছিল, এইরূপে দুই তিন মাস কেটে গেলে মালবাবুর মা আমাকে বললেন— "বাবা, তোমাকে আমি আমার সতীশের চেয়ে কিছুমাত্র তফাত মনে করিনে। আমার অনুরোধ—তুমি আমার শ্যামাঙ্গিনাকে নিয়ে আমাদের প্রকৃতই আপনার করে নেও। তোমার সতীশবাবুই যে মালবাবু তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ?"

"হাঁ, তা বুঝেছি। আপনি তাতে কি উত্তর করলেন?"

"কি আর উত্তর করব ভায়া, ঐ কথা শুনতেই একটা অব্যক্ত আনন্দের হিল্লোল এসে আমার হৃদয়টাকে আলোড়িত করে দিল। সম্মুখের দিকে চেয়ে দেখতেই তোমার ঠাকুরুণদিদির ঢল-ঢল ছল-ছল চোখ দুটির সঙ্গে তখনই শুভদৃষ্টিটা হ'য়ে গেল। তিনি মুখখানি নীচু করে সেখান থেকে সরে পড়লেন; কিন্তু আমাকে একেবারে পঞ্চশরের তীক্ষ্ণ শরে সাংঘাতিকরূপে বিদ্ধ করে গেলেন। তখন আমার সাধ্য কি ছিল যে অস্বীকার করব। তথাপি বললাম—"এ সম্বন্ধে আমার পিতার মত নইলে আমি ত কোন উত্তর দিতে পারি নে।"

তিনি উত্তর করলেন—"তোমার পিতাকে আজই পত্র লিখে দেওয়া হবে। সেই দিন যে তাঁদের বাসা থেকে ফিরলাম তারপর পুনরায় গিয়েছিলাম বিবাহের দিন।"

"আপনি যে বলেছিলেন আপনার পিতার নির্ব্বাচিত কন্যাকেই বিয়ে করতে হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি আমাদের ঠাকুরুণদিদি ত আপনারই নিজের নির্ব্বাচিত।"

"না ভায়া, ইনিই তিনি। আমার পিতাকে শ্বশুর মহাশয় বড়ই ধরেছিলেন। আমরাই তাঁদের স্বঘর, অন্য পাত্র খুঁজে না পেয়ে আমার পিতাকে কাতরতা জানিয়ে ধরেন পিতৃদেবও প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার দেশত্যাগের জন্য তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। আমার সংবাদ পেয়ে তিনি আমার শ্বশুর মহাশয়কে পত্র দিয়েছিলেন। সহজে আমি

বিবাহ করব না জেনে তাঁরা দুই বৈবাহিক ঐ ফন্দি এঁটেছিলেন। দূর হতে সুবিধা হবে না, সেজন্য আমার সম্বন্ধী অনেক চেষ্টা করে জামালপুর থেকে কহলগাঁয়ে বদলি হয়ে এসেছিলেন! যা'ক্ আমার পিতৃদেবের প্রতিশ্রুতি যে রক্ষা হয়েছিল তজ্জন্য আমি সুখী হয়েছিলাম। নতুবা আমাকে চিরজীবন অনুতাপই করতে হত!"

"ব্রাহ্মণ কিন্তু বাঁয়ে শিয়াল করে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন, দাদামশায়।"

"হাঁ, বাঁয়ে শিয়াল বলতে হবে বই কি?"

"নিশ্চয়! নইলে আপনার মত জামাতা-রত্ন কি আর যার তার ভাগ্যে ঘটে।"

"সে যা হোক্ ভায়া, এখন তুমি বিয়েটা করে ফেল তো, আমাকে যেন দোষা করে বস না।"

"না, আপনাকে দোষের ভাগী করব কেন? তবে ঐ মেয়েকে যে বিয়ে করব--তা আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পারিনে।"

"কেন ভায়া, কোথাও ঢল-ঢল ছল-ছল চোখের চাউনিতে পড়ে গিয়েছ না কি?

"ঠাকুরদাদা যদি পড়তে পারেন, তবে তাঁর নাতি পড়বে ত আর আশ্চর্য্য কি?"

"দেখ ভায়া, তোমার মার মনে যেন কষ্ট দিও না। বউমা তোমাকে বড় কষ্ট করে মানুষ করেছেন।"

"না দাদামশায়, তা কি আমি পারি, আপনি তা মনে করবেন ?"

"না ভায়া, তোমার মত ছেলে আর কয় জনের হয় ? গৌমা আমার রত্ন-গর্ভা।"

"দাদামশায়, এখন তবে আসি। বাড়ী এসেই চলে এসেছি, মা হয়ত খুঁজছেন। আপনার পায়ের ধুলোটা দিন।"

"ভায়া, আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি তোমার ঠাকুরুণদিদির মত গুণবতী ভার্য্যা লাভ কর।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:০:—

"কুমুদ, তুই বাড়ী এসেই কোথায় গিয়েছিলি বল্ দেখি ?"

"মা, আমি সার্ব্বভৌম দাদামশায়ের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

"অত তাড়াতাড়ি সেখানে যাওয়ার কি দরকার ছিল ?"

"তিনি একখান বই আন্তে লিখেছিলেন, তাই সেই বইখান দিতে গিয়েছিলাম।"

"খেয়ে দেয়ে গেলেই হত, এত তাড়াতাড়ি কি ছিল ?"

"তাড়াতাড়ি কিছু নয়, তবে একবার সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করা হয়ে গেল।"

"তা আমার বুঝি আর তোকে দেখ্তে ইচ্ছে হয় না ?"

"তোমাকে দেখা না দিয়ে কি আর কোথাও গিয়েছি ?"

"হ্যাঁ একবার একটু দেখ্লেই বুঝি হল ? এইবার বিয়ে দিয়ে দেখ্বি ছেলে কেমন জিনিষ। কেমন তোর একবার দেখে সাধ মেটে তা দেখে নেব।"

বিবাহের কথায় কুমুদ বিচলিত হইয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে

তাহার মুখখানি পাংশু বর্ণ হইয়া গেল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মহামায়া বলিলেন,—"অমন কর্‌ছিস্ যে? এবার বিয়ে না কর্‌লে আর ছাড়্‌চি নে। চিরকালই কি আমি একলা থাক্‌ব? এম্-এ পাশ করে বিয়ে কর্‌বি বলেছিলি, এখন ত এম-এ পাশ করেছিস্ এখন আর তোর আপত্তি কিসের? আমি মেয়ে ঠিক করে রেখেছি। এবার আর তোর কোন আপত্তিই শুন্‌ব না।" মহামায়ার কথায় কুমুদ চম্‌কাইয়া উঠিল ও কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"মা একেবারে পাকা কথা বলেছ নাকি?"

"সে একরকম পাকার মধ্যেই। বারশ' টাকা আয়ের সম্পত্তি মেয়েকে লেখাপড়া করে দেবে—।"

কুমুদ হাঁফ ছাড়িয়া মহামায়াকে বাধা দিয়া বলিল "তুমি বুঝি মা, লোভে পড়ে গিয়েছ? বাঁচা গেল—সংসারের ভার ত আর আমাকে নিতে হবে না। তবে তোমার বৌ এসে যখন বিষয়ের অহঙ্কারে নাক সিঁটকে বেড়াবে আর তোমাকে দিয়ে সংসারের কাজ করিয়ে নেবে তখন কিন্তু আমি তা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না, সে কথা আমি বলে রাখ্‌ছি।"

"নাক সিঁটকোবে কেন? সে ত হিন্দুর মেয়ে।"

"হিন্দুর মেয়ে হলে কি হয়? বড় লোকেরা কিরূপ অহঙ্কারী তা বুঝি তুমি জান না?"

"তারা বড় লোক তা তুই কি করে জান্‌লি?"

"মা, তোমার ছেলে বুঝি খোকা—যে কিছুই বোঝে না। বড়

লোক না হলে বার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি মেয়েকে বুঝি দেওয়া যায় ?”

মহামায়া হেসে উত্তর করলেন —“অল্প বড়লোকদের অহঙ্কার আছে বলে কি আমার বৌমা হয়ে অহঙ্কার করবে ?”

“তোমার বৌমা হলে বুঝি তার প্রকৃতিটা বদ্‌লে যাবে মনে কর ?”

“আমার বৌমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাস্‌ব, তখন কি সে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে ?”

“মা, তোমার যেমন সরল মন, পৃথিবীর সকল লোক যদি তেমন হত তবে এই সংসার কত সুখের হত। আচ্ছা মেজ জ্যেঠাইমা কি মন্দ লোক ?”

“বাঃ ! মেজদিদির মত লোক সংসারে কয় জন দেখা যায় ?”

“তবে তাঁর বৌমাটির সঙ্গে তাঁর বনে না কেন ? তবু বৌদিদির বাবা কোন সম্পত্তি লেখা পড়া করে দেন নি, দিলে যে কি হ'ত তা বলা যায় না।”

“তা বটে বাবা, কিন্তু এমন একটা সম্পত্তি ও এতগুলো টাকা নগদ্ ছেড়ে দেওয়া কি উচিত ?”

“মা তোমার ছেলের ভাগ্যে যদি বিষয় প্রাপ্তি থাকে তবে তোমার ছেলে তা রোজগার করে নিতে পারবে।”

“আচ্ছা তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই করতে পারিস্, কিন্তু এখানে যদি তোর মত না হয় তবে আরও কএকটি পাত্রী উপস্থিত আছে ;

তার মধ্যে যেটি তোর পছন্দ হয় বিয়ে কর। এবার তোর বিয়ে না দিয়ে কিছুতেই বাড়ী থেকে যেতে দেব না ”

“মা, আমি কি কখন তোমার অবাধ্য হয়েছি ? এতদিন যে বিয়ে করিনি সে কেবল পড়া শেষ না করে ঘাড়ে একটা বোঝা চাপাব না বলে। তাও তুমি জের করলে কি আর আমি না বলতে পারতাম। তোমার মনে কষ্ট দিয়ে আমি কিছুই করতে পারিনে।”

“তবে লক্ষ্মী ছেলেটির মত একটি মেয়ে পছন্দ করে ফেল। আমি এই মাসেই বিয়ে দিতে চাই। রাধারমণ একটি মেয়ের কথা লিখেছে। কলিকাতার হাইকোর্টের জজের মেয়ে। রাধারমণের সঙ্গে ঐ জজের সম্বন্ধ আছে। ঐ জজ তার শ্বশুরের জ্ঞাতি ভাই। আর তাদের বাড়ীতে রাধারমণ তোকে মাষ্টারি করে দিয়েছিল। তুই যখন তাদের বাড়ীতে মাষ্টারী করেছিস্ তখন মেয়েটিকে নিশ্চয়ই দেখেছিস্।”

এই কথা শুনিয়া কুমুদের মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কুমুদ এই প্রস্তাবটির জন্য চিন্তিত ছিল। প্রস্তাবটি আসিয়াছে শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মহামায়া পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন এই বিবাহে কুমুদের অমত হইবে না।

কুমুদ প্রশ্ন করিল—“কোন্ মেয়েটি ?”

মহামায়া বলিলেন—সে বাড়ীতে কয়টি মেয়ে আছে তাত আমি জানিনে, তবে এই মেয়েটির নাম লিখেছে সুরমা। মেয়েটিও পরমা-

সুন্দরী লিখেছে। রাধারমণ লিখেছে যদি তোর মত হয় জেনে সংবাদ দিতে। এখন এ দুটির মধ্যে কোনটি তোর পছন্দ বল ?"

"মা, জমিদারের মেয়ের চেয়ে জজের মেয়েই ভাল। আর তিনি খুব সদাশয় লোক। আমাকে তিনি নিজের ছেলের মতই ভাল বাসেন।"

"বেশ তবে আজই আমি কথাবার্ত্তা ঠিক করবার জন্য লিখে দেব। কিন্তু জমিদারের মেয়ে নিতে আমারও বড় ইচ্ছে নেই। তবে দেবে থোবে অনেক তাই একটু ভাবছিলাম। টাকার লোভে কাল মেয়ে ঘরে আনব না! তুই বেঁচে থাক্, আমার কিসের অভাব, তুই যে আমার টাকার জাহাজ।"

পরে একটা শুভদিনে জজ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা সুরমা দেবীর সহিত কুমুদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"দেখ দেখি চিঠিখানা পড়ে।" মাধবী তাঁহার স্বামী নরেশ বাবুকে বলিলেন।

নরেশ—"কার চিঠি? ও! সুরমার চিঠি না?"

মাধবী—"হাঁ সুরমারই বটে।"

"কি লিখেছে? সকলে ভাল আছে ত?"

"ভাল আর ছাই আছে। তুমি এত টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিলে একটা পাগলের সঙ্গে!"

"কেন কি হয়েছে? কুমুদ পাগল তুমি কিসে বুঝ্‌লে? বি. এল, পরীক্ষায় সে এবার প্রথম হয়েছে তাকি তুমি জান না?

"জান্‌ব না আর কেন? কেবল একজামিনে প্রথম হলে ত আর মেয়ের সুখ হবে না? তুমি তাকে ওকালতি কর্‌বার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলে, সেই টাকা নিয়ে সে মানভূমে একটা জঙ্গলা জমি বন্দবস্ত নিয়ে ফেলেছে। সেখানে না কি সে লাক্ষার চাষ কর্‌বে। সুরমা দুঃখ করে এই পত্র খানা লিখেছে।

মেয়েটাকে এত লেখা পড়া শিখিয়েছ কি একটা চাষার হাতে দেবার জন্য। সে লিখেছে তাকে এখনই নিয়ে না এলে সে আত্মহত্যা করবে।"

"কুমুদ যদি ওকালতি না করে লাক্ষার চাষ করে তাতে ক্ষতি কি?"

"বল কি গো! তুমিও পাগল হলে নাকি? তুমি হলে হাইকোর্টের জজ আর তোমার জামাই হবে কি না একজন চাষা? আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?"

"তা আমি আর কি করব, সে যদি চাষ করে, আমি বারণ করলে সে কি তা শুনবে?"

"না শোনে মেয়ের ফের বিয়ে দাও। আমার অমন মেয়ে তার জীবনটা কি বৃথা হয়ে যাবে?"

"জামাই চাষ করেছে বলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে? আর হিন্দু আইনে ত 'ডাইভোর্স' নেই যে পুনরায় বিয়ে দেওয়া যাবে।"

"তবে ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লেখাও, এই হতচ্ছাড়া ধর্মে থেকে লাভ কি?"

"ব্রাহ্ম মতে ত বিয়ে দেওয়া হয় নি, এখন ব্রাহ্ম হলে আর কি হবে?"

"তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি আছে? দেখি কুমুদকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি ফিরাতে পারি।"

"যা হ'ক শীগ্‌গির সুরমাকে নিয়ে এস, নইলে কোন দিন সে আত্মহত্যা করে বসে বলা যায় কি ?"

"আচ্ছা, আমি তাকে আনার ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

নরেশবাবু কুমুদকে কলিকাতায় আসিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়া দিলেন যে সে যেন চাষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ব্যারিষ্টারী পড়াইবার জন্য অথবা আই, সি, এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠাইতে তিনি প্রস্তুত আছেন। তার পর লাঙ্গল চাষ করার কথা শুনিয়া বাটীর সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছে এবং সুরমাও বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পত্র লিখিয়াছে। বিলাত যাওয়া যদি তাহার অনভিপ্রেত হয় তবে তিন বৎসর ওকালতি করিলে তিনি একটা মুন্সেফী সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন।

পত্রোত্তরে কুমুদ জানাইল যে সে ম্লেচ্ছ দেশে যাইতে ইচ্ছুক নহে। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য।

পত্রখানি নরেশবাবু মাধবীকে দেখাইলেন। মাধবী সেই পত্র দেখিয়া প্রধূমিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"তোমার যেমন কাজ ছিল না তাই একটা গোঁড়া ভণ্ডের হাতে এমন সোণার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়েছ। সে লক্ষ্মীছাড়ার মা মাগী যে রকম শুচিবেয়ে ছেলেটাও ঠিক সেই রকম হয়েছে। সে মাগী মেয়েটাকে কেবল টিক্‌-টিক্ করত। একটু চা পর্য্যন্ত খেতে দিত না। যাবার সময় আমি তিন বাক্স বিস্কুট দিয়েছিলাম তা একখানিও

খেতে দেয়নি। সে বলেছিল কিনা বিস্কুট খেলে তার ছোঁয়া কোন জিনিষই সে নেবে না। মেয়েটাকে গঙ্গার সেই ময়লা জলে ডুবিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে ঘরের জিনিষপত্রে হাত দিতে দিয়েছিল। প্রত্যহই সেই ঘোলা জলে স্নান করাত। সেখানে থাকলে সুরমা কি আর বাঁচত। কেন? আমরা মুচি না মুর্দফরাস যে আমাদের এমন ঘৃণা করে? জজের মেয়ে তার বাড়ীতে গিয়েছে তা সৌভাগ্য বলে মানা নেই। এমন যদি করবে তবে এখানে বিয়ে দিয়ে অপমান করা কেন? আর কখন সেখানে মেয়ে পাঠাব না।"

"সেখানে যখন বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন সে কথা বললে কি খাটবে?"

"তুমিই ত যত নষ্টের গোড়া। এ রকম অশিক্ষিত সমাজে বিয়ে দিতে গেলে কেন? তুমিই ত কুলীন কুলীন করে অস্থির। এমন শিক্ষিত হয়েও তোমার সাবেকী ধাঁজগুলো গেল না। ভাল করে না দেখে শুনে ওরকম গোঁড়াদের ঘরে মেয়ে দিলে কেন?"

"আমি আর কি করব? বাড়ীতে কে কি ভাবে চলে, আমি তা কি করে জানব? ছেলেটি ভাল, বরাবর প্রথম হয়ে হয়ে পাস করে এসেছে, আর সুরমাও তার কবিতা পড়ে তার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিল। ওদের দুজনের পরস্পরের প্রতি টান দেখে বুঝে ছিলাম—ওদের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছে।"

"ছোট লোকের ছেলেকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া কেন? তুমি কি আর উপেনকে পড়াবার জন্য মাষ্টার পাওনি?"

"হাঁ, ওটা আমার ভুল হয়েছিল, মাধবী। একজন জমিদারের ছেলে অথবা একজন বিলেত ফেরত দেখে মাষ্টার না রেখে সে স্বভাব কুলীনের ছেলেকে মাষ্টার রেখেছিলাম সে ভুল এখন বেশ বুঝতে পারছি।"

"একশবার ভুল করেছ! তুমি তা স্বীকার কর আর নাই কর।"

"এখন তুমি ত আমাকে দোষ দিচ্ছ, কিন্তু তুমিও যে সে সময়ে তার সঙ্গে সুরমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলে। তুমিও ত জানতে ছেলেটি একটু সেকেলে ধরণের। চা খেতে যে দিন রাত্রি হয়ে যেত সে দিন সে সন্ধ্যা না করে চা খেত না। তাও ত তুমি দেখেছ?"

"তখন মনে করেছিলাম ওসব গোঁড়ামী পাড়া গেঁয়ে লোকের একটু থাকে তা সুরমা তাকে ঠিক করে নেবে। তার মা মাগী যে এত শুচিবেয়ে তা কে জানত? ছেলেও তেমনি হাঁদারাম মা যা বলবে সে অমনি কলের পুতুলের মত তাই করবে। বাপু, তুই লেখা পড়া শিখেছিস, তোর এত গোঁড়ামী কেন? তুই বিয়ে করেছিস, স্ত্রীর প্রতি কি তোর কোন কর্ত্তব্যই নেই?"

———

নবম পরিচ্ছেদ

নরেশবাবু কলিকাতা গেজেটখানি দেখিতেছিলেন,—হঠাৎ তাঁহার চক্ষু পড়িল ষ্টুডেণ্ট্‌শিপ পরীক্ষার ফলের উপর। কুমুদের এবার পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল বটে কিন্তু সে ত চাষ করিতে ময়নকুম চলিয়া গিয়াছে। এই কথা মনে হইতেই হৃদয়ে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিলেন। কুমুদ পরীক্ষা দিলে যে কৃতকার্য্য হইত এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কোন ভাগ্যবান্‌ এ বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল দেখিতে যাইয়া কুমুদেরই নাম দেখিয়া তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মাধবী এমন জামাতার উপর অসন্তুষ্ট। নাই বা করিল সে ওকালতি, সে ত মূর্খ নয়। সে মুন্সেফী করিতে স্বীকৃত হয় নাই। গোলামীতে যে কি সুখ তাহা তিনি নিজেই ত বেশ অনুভব করিতেছেন। জামাতা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যাহার জন্ম মাধবীর এ ক্রোধ হইল। তিনি বাসায় ফিরিয়া মাধবীকে কুমুদের পাসের সংবাদ দিলেন। মাধবী সেকথা শুনিয়া কোন উত্তরই দিলেন না।

নরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার জামাইয়ের এত বড় পাসের খবরটা দিলাম, তুমি যে কোন উত্তরই দিলে না ?"

"উত্তর আবার কি দেব ? রামা শ্যামা পাস হওয়াও যা, সে পাস হওয়াও তাই। তার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ কি ?"

"সে কি কথা বলছ, সে পর হল কি করে ?"

"যে আমাদের কথার বাধ্য নয় তার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?"

"আচ্ছা, উপেন যদি তোমার কথার বাধ্য না হয়, তবে কি তুমি তাকে ত্যাগ করতে পারবে ?"

"নিশ্চয় পারব ! আমাকে এমন মেয়ে পাওনি।"

"আচ্ছা, তুমিই যে ঠিক বুঝছ আর সে যে সবই ভুল বুঝেছে, তা তুমি নিশ্চয় রূপে কি করে বলতে পার ?"

"এ আর কে না বোঝে ? নিজের স্ত্রীকে কাঁদিয়ে যে খামখেয়ালী করে বেড়ায় সে ভাল কাজ করছে এটা তুমি মনে করতে পার কিন্তু আমি তা কখনই পারব না, এ তুমি নিশ্চয় জেন।"

পিতা মাতার মধ্যে কি জন্য বচসা হইতেছে জানিবার জন্য সুরমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নরেশবাবু বলিলেন—"সুরমা, কুমুদ ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, গেজেটে দেখে এলাম।"

সুরমা কোন উত্তর দিল না কিন্তু তাহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। নরেশবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন সুরমা পিতা মাতার বচসার কারণ বুঝিল—সে সেখানে আর

থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। সে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মাধবী বলিলেন—"সুরমাকে ঐ খবর দিতে গেলে কেন? ওকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হল?"

"সুরমার কষ্ট হল কি করে বুঝ্লে? তোমার মাথাটা নিতান্তই বিগড়ে গেল দেখ্ছি।"

"ওর পক্ষে ওটা খাস খবর হল কি করে? তারা দুই মায়ে বেটায় সুরমাকে যে অপমানটা করেছে তা ত তোমার বুঝ্বার শক্তি নেই। তুমি জামাইয়ের গুণই দেখ্তে পাও।"

"অপমানটা কি করেছে?"

"বাপ-মার নিন্দে কর্লে বুঝি ছেলে পিলের সম্মান করা হয়? আমরা সুরমাকে যেম করে রেখেছি, আমাদের মত খ্রীষ্টানি মত। আমরা ত আর তাদের মত গোঁড়ামী করতে পার্ব না। কুমুদ বিদেশে চলে গেল। যাবার সময় সুরমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করে গেল না। এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে?"

"আমি ত আর সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। তবে তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, কুমুদের এ কাজটা ভাল হয়নি।"

"বল কি গো, এই অপমানের কথা শুনে কোন পুরুষ নীরব থাকতে পারে? অন্য পুরুষ হলে একথা শুনে কি চুপ করে থাকতো?

"চুপ করে থাক্‌ব না ত কি কর্‌ব? আমি যে মেয়ের বাবা।

"মেয়ের বাবা হলে বুঝি তার পুরুষত্ব চলে যায়? তুমি চিরদিনই মেয়ের বাবা হয়ে থাক। আমি কিন্তু দেখিয়ে দেব মেয়ের মা কি রকম নিজের তেজ বজায় রাখতে পারে।"

"বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ করগে।"

"তা ত করবই, তোমার মত কাঁদুনি গেয়ে পত্র দিলে কি আর সে পথে আসবে? আজ আমি কড়া কড়া শুনিয়ে পত্র দেব —দেখি সে পথে আসে কি না?"

"কড়া কথা বললে যদি উল্টো ফল হয়, সে যদি তোমার মেয়েকে ত্যাগ করে বসে, তখন কি হবে?"

"ত্যাগ করতে কি আর বাকি রেখেছে? আমি তো সে বিষয়ে স্পষ্টই উত্তর চাই। সে ত্যাগ করলাম বলে পত্র দিলেই ত হয়। তখনই মেয়ের বিয়ে দেব। এমন সুন্দরী ও গুণবতী মেয়ে লোকে পাবে কোথা?"

"আমার বিশ্বাস ছিল—মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ভাল, কিন্তু তোমার কাণ্ড দেখে আমার তাক্ লেগে গিয়েছে।"

"মেয়েদের লেখাপড়া শেখা এখন খারাপ লাগবে বইকি, মেয়েরা চিরকাল অজ্ঞ হয়ে থাকুক, আর তোমরা তাদের ক্রীতদাসী করে রাখ। মেয়েরা জ্ঞানান্ধ হয়ে না থাকলে তোমরা যথা করে প্রভুত্ব করবে কি করে? আমার মত তা পাওনি? আমি আমার শিক্ষার সদ্ব্যবহার নিশ্চয়ই করব। আমার যা কিছু জ্ঞান, শক্তি বা সমর্থ সকলই স্ত্রীজাতির মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করব।"

"কি করে তা করবে?"

"কেন, আমি দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াব, আর সকল নারীকে উপদেশ দেব।"

"একেলা?"

"একেলা নয় ত তুমি আমার সঙ্গে যাবে নাকি? তোমাদের পুরুষ জাতির সাহায্যও আমি চাই নে।"

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—এই বচনটা কি তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও?"

"ঐ বচনটা রচনা করেছিল কে? পুরুষে না মেয়ে মানুষে? তোমাদের স্বার্থপর কথায় আর ভুলছিনে। ইউরোপীয় জাতির মেয়েরা কি স্বাধীন ভাবে বেড়ায় না?"

"বেড়াবে না কেন, কিন্তু তার ফল কি ভাল হয় বলে মনে কর?"

"কেন মন্দটা কি হয়, তুমি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এমন অনুদার কথা কি করে বললে?"

"আমি যদি অনুদার হ'তাম—তা' হ'লে কি তুমি বি-এ পর্য্যন্ত পড়তে পারতে?"

"দেখ তোমাদের শাস্ত্র কেবল নারীর প্রতি ঘোর অত্যাচারের ব্যবস্থা করেছে। স্ত্রী যেন তোমাদের সেবা করবার জন্যই জন্মেছে। তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি তোমাদের মোটেই লক্ষ্য নেই। কিন্তু তোমাদের সময় একটু ত্রুটী হলে আর রক্ষা থাকে না।"

"আমি কি তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করি ?"

"তুমি কর একথা ত আমি বল্‌ছি নে। তোমাদের পুরুষ জাতির কথাই বল্‌ছি। এই বিংশ শতাব্দীতেও তোমরা নারীকে অধিকার দিতে কিরূপ নারাজ তা তোমাকে পদে পদে দেখিয়ে দিতে পারি। গবর্ণমেন্ট স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার দিতে প্রস্তুত হলেও তোমরা বাধা প্রদান করতে কি ত্রুটি করেছ ? মেয়েদের ওকালতি করতে দেবে না ; তারা যে এত কষ্ট করে ওকালতি পাস করল ও ব্যারিষ্টারি পাস করে এল কি কেবল তোমাদের পদ সেবা করবার জন্য ? তোমরা নারীর কোন অধিকারটা বিনা বাধায় ছাড়তে প্রস্তুত তা আমাকে দেখিয়ে দেও দেখি ? তোমাদের পক্ষপাত মূলক শাস্ত্রের বচন সম্বন্ধে তোমার আর কি কথা আছে আমি শুনতে চাই।"

"শাস্ত্রের দোষ দেও কেন ? শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করতে বলে না মনুতেই আছে।

''স্নেহেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্ দারান্নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥

"হাঁ, ও ব্যবস্থাটা মুসলমানের মুরগী পোষার মতই বটে। কেননা ঐ সকল তুচ্ছ জিনিষ দিয়ে ও মিষ্ট কথা বলে ভুলিয়ে রাখ্‌লে স্ত্রী প্রাণ দিয়ে খাটবে। ভালবাসা কথাটা সমানে সমানেই সম্ভব হতে পারে। কাজেই পুরুষেরা চায় স্ত্রীজাতিকে ভুলিয়ে ভক্তি আদায় করে নিতে। সেইজন্য তোমাদের শাস্ত্রে পতি হচ্ছেন

দেবতা। যেমন তোমাদের মনসা হলেন দেবতা। ভক্তি করবে ত ইবেশ নলে এক ছোবোল বসিয়ে দেওয়া হবে। চিরকাল কি: আর চালাকি খাটে? ইংরাজ তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়ে যেমন বিপদে পড়েছে, তোমরাও মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তেমনি বিপদে পড়েছ। কিন্তু এখন ত হাতের ঢিল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর ত তোমাদের হাত নেই।"

"লেখাপড়া শিখিয়ে অন্ততঃ আমি যে বিপদে পড়েছি তাতে আর সন্দেহ কি আছে? বিশেষ ইংরাজী পড়িয়ে। তবে তুমি এরূপ মনে করো না যে শাস্ত্র স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনুদার—কন্যা প্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াপি যত্নতঃ।"

"হ্যাঁ সেই জন্যই ত শিক্ষিত হিন্দুনারীর সংখ্যা এত অধিক। এতেই বোঝা যায় তোমাদের শাস্ত্রকারগণ কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে গেলেও তোমরা সেটা বড় কাজে আনতে চাওনা। শাস্ত্রে যে নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তা কি কখন তোমরা স্ত্রীজাতিকে জানতে দিয়েছ? তাদের শিক্ষা দিয়েছ কেবল বাসন মাজতে। যাই দেশে উদারপ্রকৃতি ইংরাজের আবির্ভাব হয়েছিল তাই আজ তোমাদেরও মুখ দিয়ে ফসকে ঐ বচন বেরিয়ে পড়েছে। সেটাও যে তোমরা ইচ্ছে করে প্রকাশ করেছ তা নয়। ইংরাজ যখন স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে তোমাদের দোষারোপ করলেন—তখন তোমরা ঐ সকল বচন উল্লেখ করে সাফাই দিলে। যা হ'ক নারীর মধ্যে

কএকজন যখন শিক্ষিতা হয়েছেন তখন তোমাদের শাস্ত্র যাই বলুক্ তারা আর অজ্ঞ থাকবে না। তারা এখন বেশ বুঝতে পেরেছে যে তাদেরও জন্মগত অধিকার আছে। তারা ক্রীতদাসী হয়ে জন্মায় নি তোমরাই তাদের বলপূর্ব্বক ক্রীতদাসী করে রেখেছ। আমি একজন শিক্ষিতা রমণী, আমাকে এর প্রতিবিধান করতেই হবে।"

"তুমি একা কি করে প্রতিকার করবে "

"আমি একা কি করে হলাম? আরও অনেক শিক্ষিতা নারী রয়েছেন। তাঁরা অবশ্যই আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। তাঁদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করব।"

"সেই সমিতির উদ্দেশ্য কি হবে?"

"সেই সমিতির উদ্দেশ্য হবে—

১। স্ত্রী-স্বাধীনতা।

২। স্ত্রী-শিক্ষা।

৩। স্ত্রীগণ যাহাতে নির্ম্মল স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা।

৪। কন্যার বিবাহে পণ-প্রথা রহিত করা।

৫। পতিতাদের আশ্রয়-দান।

"ভাল কথা, কিন্তু তোমরা যে স্বাধীন ভাবে বেড়াবে, দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে কি করে আত্ম-রক্ষা করবে?"

"কেন, আমরা রীতিমত ব্যায়াম করব। যাতে আমরা

সবল হতে পারি তার ব্যবস্থা করব। আমরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখ্‌ব ও অস্ত্র চালনা শিক্ষা করব। তা হ'লে দুর্বৃত্তগণ আমাদের আক্রমণ করতে সাহসী হবে না। সকল রমণীই অস্ত্রধারিণী ও বলিষ্ঠ হলে পরস্পর সাহায্য করতে পারবে।"

"তোমার এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি, এরূপ হতে পারলে ধর্ষিতার সংখ্যা একেবারেই কমে যাবে। বর্ত্তমান সমস্যার দিনে স্ত্রীজাতির মধ্যে এইরূপ বাহুবলই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর আমি যে স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী তার প্রমাণ তুমিও বটে ও সুরমাও বটে। তোমার তৃতীয় উদ্দেশ্যও সুন্দর। কেহ বিধবা হলেই আত্মীয়ের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, আর তাঁরা তাদের দিয়ে পাচিকা বা পরিচারিকার কাজ করিয়ে নেন, এটা কখনই সমর্থন করা যেতে পারে না। তোমাদের চতুর্থ উদ্দেশ্য যতদূর কার্য্যকরী হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"সন্দেহ আর কি আছে? মেয়েরা যদি ইচ্ছা মত বিয়ে করতে পারে, তবে পণ-প্রথা চলবে কি করে? মেয়েরা যদি পণ দিয়ে বিয়ে না করে তবে পুরুষেরা বিয়ে না করে কতদিন থাকবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে একতা চাই—নইলে কোন ফল হবে না।"

"এতে ফল এই হবে—যে কতকগুলি মেয়ের বিয়েই হবে না।"

"না হয় নাই হবে। বিয়ে করে পুরুষের বাঁদী হওয়ার চেয়ে

অবিবাহিতা থাকা কি শতগুণে শ্রেয় নয়? সে-কালে কুলীনের মেয়েরা যে অনেকেই অবিবাহিতা থাকতেন তাতে কি ক্ষতি হয়েছে? আমরা অবশ্য ঐ সকল অনূঢ়াদের জন্য স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা করব। যাতে তাদের বাপ ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে না থাকতে হয় তাহার ব্যবস্থা করব। তাদের ন্যায় বিধবাদেরও ব্যবস্থা করা হবে এবং পতিতাদের মধ্যে যাঁরা পবিত্র জীবন যাপনে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও এই একই ব্যবস্থা করতে হবে। এঁদের মধ্যে যদি কারও মনের মত পাত্র উপস্থিত হয়, তিনি বিয়ে করে গৃহস্থ হতে পারবেন।"

"তা হলে তুমি বিধবাদেরও বিয়ে দিতে চাও?"

"কেন চাইব না? পুরুষরা যত ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবেন তাতে কোন বাধা হবে না, আর স্ত্রীলোকেরা বিধবা হলেই চির-দুঃখিনী হবেন, এ কখনও ন্যায়-সঙ্গত হতে পারে না। তোমাদের শাস্ত্র কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করেছে দেখ দেখি, যুবতী বিধবা কন্যা একাদশীর দিনে নিরম্বু উপবাসী থাকবে আর সারারাত্রি একঢোক জলের জন্য ছটফট করবে, আর বৃদ্ধ পিতা তৃতীয় পক্ষের ষোড়শী ভার্য্যা নিয়ে পার্শ্বের ঘরে বিহার করবেন। এই পক্ষপাত-মূলক বিধানের ভিত্তি পুরুষের স্বার্থপরতার উপর গঠিত হয়নি কি?"

"তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে। তুমি যদি সমাজের এই সকল বিধি নিষেধ পরিবর্ত্তন করাতে পার তাতে আর আমার কি আপত্তি আছে?"

"না, আমি তোমার ভাসা ভাসা কথা শুনব না। আমি যা বললাম, তার বিরুদ্ধে তোমার কি বলার আছে তাই শুনতে চাই?"

"আমার বড় কিছু বলার নাই। স্ত্রীজাতির পক্ষে যেমন সংযম আবশ্যক, পুরুষের পক্ষেও তাহাই প্রয়োজন—পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্—

আমার মতে কেহ যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃতদার হন, তবে তিনি পরিণত বয়সেও দারপরিগ্রহ করলে তাঁকে দোষ দিতে পারি নে। তবে পুত্রবানের পক্ষে ভার্য্যান্তর গ্রহণ আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি নে!"

দশম পরিচ্ছেদ

—:০:—

"কি ঠাকুরপো কোথা থেকে এলে? ওরে সুরমা, তোর কাকা এসেছেন, প্রণাম কর্।"

"এই বউঠাকরুণ ভ্রমণ করতে করতে এসে পড়্লাম।"

"কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

"কত আর নাম কর্‌ব, বৌঠাকরুণ।"

"কি জন্য যাওয়া হয়েছিল?"

"এই ভিক্ষাবৃত্তি আর কি?"

"ঠাকুরপো, তুমি ভিক্ষা করো কেন? মাথাটা কামিয়ে উড়েদের মত বিট্‌কেল ঢং করেছ যে?"

"ভিক্ষা না করে আর কি উপায় আছে বলুন! আর দেখুন ভেক নইলে কি ভিক্ষা মেলে? তাই এই ঢং করতে হয়েছে।"

"কর্‌ছ কি ঠাকুরপো, পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?"

"আপনার পদধূলি গ্রহণ কর্‌ব না?"

"আমি যে তোমার চেয়ে বয়সে ছোট।"

"তা হলে কি হয়, আপনি যে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া, দাদার

অর্দ্ধাঙ্গিনী। দাদা আমার যেমন পূজ্য আপনিও আমার তেমনি পূজনীয়া।"

"ঠাকুরপো, তুমি আর ভিক্ষে কর্‌তে যেও না। তোমার দাদা হলেন জজ, আর তুমি কিনা যাবে ভিক্ষে কর্‌তে।"

"কি করি বৌঠাকরুণ, ভিক্ষান্ত ব্রাহ্মণের একটা বৃত্তি।"

"না ঠাকুরপো, শিষ্য যজমান রয়েছে কি কর্‌তে? তোমার দাদা ত আর তার ভাগ নিতে যাচ্ছেন না, তখন তোমার চল্‌বে না কেন?"

"শিষ্য যজমানে কি আর চলে বৌঠাকরুণ? আজ কাল শিষ্যালয়ে গেলে তারা মনে করে কেন তারা কত বিপদেই পড়েছে। আর যজমানী তাতেই বা চল্‌বে কি করে? পূজা পার্ব্বণ ত একরূপ উঠেই গিয়েছে। কাজের মধ্যে বিয়ে আর পৈতে, আর মেরে কেটে আন্ত শ্রাদ্ধটা না কর্‌লে নয় তাই করে। পূর্ব্বে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ পত্র আস্‌ত তাতে পাওনা থোওনা মন্দ হতনা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের একরূপ মন্দ চল্‌ত না।"

"আচ্ছা ভিক্ষে যে কর তাতে কিছু হয়?"

"ছাই হয় বৌঠাকরুণ—ভিক্ষায়াং নৈ বচ নৈ বচ—তাতে কি জানেন পূজার পূর্ব্বে ঘুরে ফিরে দু' দশ টাকা যা হয় তাতে পূজার কাপড়টা চোপড়টার জন্য আর চিন্তা করতে হয় না।"

"শুন্‌তে পাই তোমার অবস্থা না কি ফিরেছে। বৌয়ের গায়ে গহনাও বেশ দিয়েছ।"

"সে সব কি আর শিষ্য যজমানের আয় থেকে হয়েছে মনে করেন? আজ কাল যজ্ঞোপবীত লওয়ার হুজুগটা উঠেছে তাই ত পয়সা পাচ্ছি। গত বৎসর পোদেরা ধরে বসেছিল যে তাদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে একটা ব্যবস্থা দিলে ৫০০৲ টাকা দেবে, তাই একটা ব্যবস্থা দিয়েছিলাম।"

"তা এমন একটা অব্যবস্থা দিলে কেন?"

"আমি ব্রাত্যক্ষত্রিয় বললেই কি তারা ক্ষত্রিয় হয়ে গেল? ক্ষত্রিয়েরা কি তাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করবেন? তারা যে পোদ সেই পোদই আছে, মাঝে থেকে এই গরিবের কিছু প্রাপ্তি হয়ে গেল। বক্ষরস্ত ধন ক্ষয়।"

"সেই টাকা দিয়ে বুঝি বৌয়ের গহনা গড়িয়ে দিয়েছ?"

"হাঁ বৌঠাকরুণ, টাকার কথা শুনে ব্রাহ্মণী ধরে বসলেন তাঁর গহনা চাই। মনে করলাম টাকাটা ত উপ্‌কো এসে পড়ল, তা তাঁর কিছু সংস্থানই করে দিই। ভাল করিনি বৌঠাকরুণ?"

"বেশ করেছ ঠাকুরপো। বৌ শাঁখা হাতে দিয়ে লোকের বাড়ী বেরুবে সেটা কি ভাল দেখায়? সেত মেয়ে মানুষ তারও ত সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে করে। তোমরা পুরুষ, তোমাদের সখ না থাকতে পারে, তাই বলে কি মেয়েরা সখ করবে না? মহাদেব ত সন্ন্যাসী, তাই বলে ভগবতী কি সাজ গোজ করেন না।"

"তাত বটেই বৌঠাকরুণ, লোকে বলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৌ

আবার সাজসজ্জা করবে কেন? আপনি চমৎকার নজিরটি কিন্তু দেখিয়ে দিলেন। আমার এত দিন খেয়ালই হয় নি।"

"কি নজির দেখালাম?"

"কেন ঐ মা দুর্গার নজির।"

"ভারি ত নজির দেখিয়েছি, ও আর কে না জানে?"

"জানে ত সবাই, কিন্তু প্রয়োজনের সময় ত খেয়াল থাকে না। সে দিন শশী বাঁড়ুজ্যে আমার সঙ্গে ঝগড়াই আরম্ভ করে দিল। বলে কিনা, ভট্টচাজ্জি ব্রাহ্মণের স্ত্রী আবার সেমিজ এঁটে বেড়াবে কেন? আপনার দয়ায় চচারটে প্রসাদী সেমিজ টেমিজ বাড়ীতে পরতে পায় ও ছেলে পিলেগুলোও হ্যাটকোট পরে তাতে গ্রামের লোকের হিংসায় আর টেঁকবার জো নেই।"

"তুমি গ্রামের লোকের কথায় কাণ দেও কেন?"

"তাই কি আমি দিই? বলুক সে বেটারা যা ইচ্ছা, তাই বলে কি আমি তাঁকে সন্ন্যাসিনী সাজাতে পারি?"

"ঠাকুরপো, তুমিই মানুষ, স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয়, তা তুমি জান। বৌ অনেক পুণ্য করে তোমাকে স্বামী পেয়েছে। তোমার দাদা কেমন লোক জান? আমি যা বলব কেবল তার উল্টো করে বসবেন।"

"কেন, দাদা কি করেছেন?"

"এই দেখ ভাই, সুরমার বিয়ে দিলেন একটা এম, এ পাস করা ছেলের সঙ্গে। সে যখন বি-এল পরীক্ষায় প্রথম হল তখন মনে

কর্লাম মেয়েটা সুখী হবে। কিন্তু দুরদৃষ্টের কথা কি বল্ব—ছেলেটা তার মার পরামর্শে মানভূমে গিয়ে লাক্ষার চাষ কর্তে আরম্ভ করে দিয়েছে। সুরমাকে তারা যা কষ্ট দেবার তা দিয়েছে। সে তাদের কাজের প্রতিবাদ করেছিল বলে তাকে ত্যাগ করে বসেছে! আমি তোমার দাদাকে বল্লাম মেয়েটার ফের বিয়ে দেও। তা তিনি বল্লেন কিনা হিন্দুর মেয়ের একবার বিয়ে হলে কি আর ফের বিয়ে হয়। তুমিত ভাই পণ্ডিত মানুষ তুমি বল দেখি—হিন্দুশাস্ত্রে মেয়েদের পুনরায় বিয়ে দেওয়া চলে কি না?"

"তাইত বৌঠাকরুণ, সেরূপ ব্যবস্থা ত কিছু দেখিনে।"

'না ভাই, একবার ভাল করে পুঁথিগুলো হাঁটকে দেখে একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে ভাই। তুমি একটা অকাট্য ব্যবস্থা' দেবে যাতে তোমার দাদা আর কথাটি না বল্তে পারেন। এ রকম একটা ব্যবস্থা দিতে পার্লে ছোট বৌকে আমি একখান দামী গহনা দেব।"

"তা দেবেন বৈ কি বৌঠাকরুণ, আপনি দেন বলেই ত তার কোন অভাব নেই। তা দেবেন বৈ কি; আপনার ছোট ভগিনী ত বটে। আপনার মত গুণের বৌ আর কটাই বা সংসারে আছে। আপনাকে একটা ব্যবস্থা দেব বলে কি আপনি দেবেন। আপনি দিচ্ছেন না ত আমার সংসার চল্ছে কিসে? হাঁ বৌঠাকরুণ ভাল একটা ব্যবস্থা মনে হয়েছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

বাবাজি যখন এত লেখাপড়া শিখে চাষ করতে গিয়েছেন তখন তিনি নষ্ট ত হয়েছেনই। আর মৃত—যখন তিনি শ্রীমতী মাতাকে পরিত্যাগ করেছেন—তখন তিনি শ্রীমতী মাতার পক্ষে মৃত বই আর কি? প্রব্রজিত—যখন তিনি এই বাঙলাদেশ ত্যাগ করে মানভূমে গিয়ে বাস করছেন—তখন প্রব্রজিত বলাযেতে পারে। আর ক্লীব—তা যে পত্নীর প্রতি একেবারে উদাসীন সে ক্লীব নয় ত আর কি হতে পারে? আর পতিত—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? যে একজন জাঁদরেল উকিল কি ব্যারিষ্টার অথবা জজ কি ম্যাজিষ্টর হতে পারত, সে হল কিনা একজন চাষা, এর চেয়ে পতন আর মানুষের কি হতে পারে? দেখুন বৌঠাকরুণ, এই পাঁচটা আপদের মধ্যে সব কয়টাই শ্রীমতী মাতার পক্ষে প্রযোজ্য। অতএব পত্যন্তর গ্রহণে শ্রীমতী মাতার কোন বাধাই নেই।

"ঠাকুরপো, বেঁচে থাক, আমার যত চুল তত তোমার পরমায়ু হ'ক। আজ তোমার দাদাকে একবার দেখে নেব।"

"তা নেবেন, এটা অকাট্য প্রমাণ। এতে দাদার কি আর কোন কথা বলার জো থাকবে?"

"ঠাকুরপো, যাও হাত পা ধোওগে, ঝি জলখাবার নিয়ে এসেছে।"

"করেছেন কি বৌঠাকরুণ! আমি কি সন্দেশ খাই?"

"সন্দেশ খাওনা ত কি খাও?"

"আজ্ঞে আমি যে গুড় খেয়ে থাকি;"

"সে কি ঠাকুরপো, গুড়খেতে যাবে কেন? এত সুন্দর সুন্দর খাবার থাকতে অখাদ্য গুড় খাবে?"

"তা কি জানেন, আমাদের ব্যবসাটা খারাপ, লোকের কাছে ভড়ংটা রাখ্‌তে হবেত?"

"না—তা হবে না, আমার কাছে তোমার কোন ভড়ং খাটবে না। সন্দেশ তোমাকে খেতেই হবে। ঝি, যা ত শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে পা ধোবার জল এনে দে।"

"বৌঠাকরুণের আদেশ ত আর অমান্য করতে পারব না।" এই কথা বলিয়া কটকচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় পদধৌত করিয়া সস্মিত বদনে জলযোগে বসিলেন।

"ঠাকুরপো, রাবড়ী খেলে না যে?"

"না বৌঠাকরুণ, গোয়ালারা কি দিয়ে প্রস্তুত করেছে তাত ঠিক নেই।"

"কি দিয়ে আবার করবে? দুধ জাল দিয়ে তয়ের করেছে। এমন সুন্দর জিনিষ কি কখন পাড়াগাঁয়ে পাওয়া যায়? একটু খেয়েই দেখ না, তখন বুঝ্‌তে পারবে।"

"তাইত বৌঠাকরুণ, বড় উপাদেয় জিনিষ ত। আমাদের

পল্লীগ্রামের ক্ষীর আর এ ক্ষীর স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ! কেমন সুন্দর গন্ধ করেছে।”

“হাঁ গোলাপ জল দিয়েছে কিনা, তাই এমন সুন্দর গন্ধ হয়েছে।”

“এই মাটি করে দিলেন দেখছি, শেষে গোয়ালার জলটা খাওয়া হয়ে গেল। একটা চান্দ্রায়ণ করতে হবে দেখছি।”

“গোলাপজল বুঝি সাধারণ জল? ও যে ‘ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার’ ওকি আর গোয়ালা কলসী বোঝাই করে নদী থেকে এনেছে? ও গাজিপুর থেকে আমদানা হয়—ওর নাম গোলাপের নির্য্যাস, সেখ ফসিউল্লার ওটা নিজস্ব। আর আমাদের সুমুকের দোকানে গোলাপের নির্য্যাসই ব্যবহার করে থাকে।”

“তবু ভাল বৌঠাকরুণ। দেখবেন, দেশের কোন লোক এসে বলবেন আমি কেবল গুড় আর গঙ্গাজল খেয়েছি। আপনাকে দেবতার মত ভক্তি করি কিনা—তাই আপনার আদেশও আমি কখনই অবহেলা করতে পারিনে।”

“না—ঠাকুরপো তুমি তার জন্যে ভেব না। আমাকে কি এমনিই মনে কর, যে যাতে তোমার পসারের হানি হবে এমন কাজ আমি করব? কার এমন সাহস আছে যে তোমার খাওয়ার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসবে। দেখ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে যদি সুখাদ্য ও সুপেয় উপভোগ না করলে তবে আর কি

হ'ল? তা লুকিয়ে একটু আধটু খাবে বই কি, মাঝে মাঝে আমার এখানে এসে মুখটা বদলে যেও।"

"নিশ্চয়ই আসব, আপনি কত স্নেহ করেন। আপনার মত গুণের বৌ কি আর আছে? আপনি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। দাদা কত তপস্যা করে আপনার মত স্ত্রীরত্ন লাভ করেছেন।"

"না ঠাকুরপো, আমার আর কি গুণ আছে? তা রাত্রিতে কি খাও?"

"আমাদের আর খাওয়া বৌঠাক্রুণ, যা হয় তা কিছু খেলেই হ'ল। কিছু ফলটল, আর একেবারে খাঁটি দুগ্ধ, গোয়ালার জল যেন তাতে একটুও না থাকে।"

"তা হবে না ঠাকুরপো, কতদিন পরে এলে ফলমূল খাবে কি? আমি ত মনে করছিলাম মাংস আর পোলাও ব্যবস্থা করব।"

"সর্ব্বনাশ বৌঠাক্রুণ! তা হলে যা একটু পসার জমিয়েছি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কি আর মৎস্য মাংস ভক্ষণ করি?"

"সে হচ্ছে না, গোঁসাই ঠাকুর হয়ে পড়লে চলবে কেন? কে আর টের পেতে যাচ্ছে? এমন উপাদেয় খাদ্যগুলি ত্যাগ করে কি করে আছ?"

"বৌঠাক্রুণ, কি আর বলব, খেতে কি আর ইচ্ছে করে না, তবে কি জানেন ঐ সকল বস্তু কি আর আমাদের ভাগ্যে জোটে?

এক টাকা পাঁচ সিকে করে মাছের সের হয়েছে, তা আর খাব কোথা থেকে? সে কালের মত ভোজও আর নেই যে পরমুণ্ডে মুখটা মাঝে মাঝে বদলান যাবে! তাই ভাবলাম মৎস্য মাংসটা ছেড়েই দিই, তা হলে বৈষ্ণব মহলেও পসারটা জম্‌কে যাবে।"

"তা বেশ করেছ, আমার কাছে এসে লুকিয়ে মাঝে মাঝে মুখটা বদ্‌লে যেও।"

"আস্‌ব বৈকি, আপনার আজ্ঞাত আর লঙ্ঘন কর্‌তে পার্‌ব না। আপনাকে যে আমি দেবা মনে করেই ভক্তি করে থাকি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

নরেশ বাবু কাছারী হইতে বাটী ফিরিয়া ডাকিলেন—"আমার মা কোথায় গো?"

সুরমা উত্তর দিল—"যাই বাবা।"

"শুধু এলে হবে না মা, শীগ্‌গির চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।" এই বলিয়া তিনি ইজি চেয়ারে ধপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

"বাবা আপনার কি অসুখ করেছে?"

"না মা, আজ বড় একটা জটিল মোকর্দ্দমা ছিল, তাই খাটুনিটে বড়ই অধিক হয়েছে আর মাথাটাও একটু ধরেছে।"

এমন সময় ফটিক স্মৃতিতীর্থ আসিয়া নরেশ বাবুকে প্রণাম করিলেন।

"কি ফটিক যে কখন এলে ভাই?"

"দাদা, এই ঘণ্টা দুই হল এসেছি।"

"বাড়ীর খবর কি, বৌমা ছেলেপিলে ভাল আছে ত?"

"আজ্ঞে, সকলে আছে একরকম মন্দ নয়।"

এবার কয়জন ছাত্র পাস করল ?"

"জন দুই পাস করেছে।"

"মোটে দুইজন ? কিসে পাস করল ?"

"একজন স্মৃতির আদ্য আর একজন মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।"

"মোটে দুইজন ? কিছু বেশী করে ছাত্র রাখ—নইলে সুবিধা হবে কেন ?"

"বেশী করে ছাত্র ত আর রাখ্‌তে পারিনে। আপনি যেই পনর টাকা করে দেন তাই দু'চার জন ছাত্র রাখ্‌তে পারি।"

"আমি এ বছর থেকে পঁচিশ টাকা করে দেব, আরও কিছু ছাত্র রাখগে।"

"তাই রাখ্‌ব দাদা, উপাধি দেওয়ার ছাত্র বড় পাওয়া যায় না। পাড়াগাঁয়ে বড় কেউ যেতে চায় না। এবার দু-একটা উপাধি দেওয়ার ছাত্র চেষ্টা করে দেখ্‌ব। ছাত্র আর বড় মেলে না। সবাই ইংরাজী পড়্‌তে আরম্ভ করেছে, সংস্কৃত আর কয়টা ছেলেতেই বা পড়ে ?"

"কি করতে আর পড়্‌বে ? তুমি নিজেকে দিয়ে বুঝ্‌তে পারছ না ?"

"দাদা, আপনি যদি আমার জন্ত একটু চেষ্টা করতেন তবে কিছু সুবিধা হতে পারত।"

"কি আর চেষ্টা কর্‌তে বল? চাকরী টাকরী কর্‌তে ইচ্ছা কর না কি?"

"না দাদা, চাকরী করায় ত ইচ্ছে নেই। তা সাহেবরা ত আপনার হাতধরা; তাদের বলে কয়ে মহামহোপাধ্যায় উপাধিটা যদি বাগিয়ে দিতে পারেন।"

"ভাই ইংরেজ জাত কি কারু হাতধরা মনে কর? তোমার ছাত্ররা হয় আদ্য না হয় মধ্য পরীক্ষায় পাশ হয় সেরূপক্ষেত্রে সাহেবদের বল্‌লে যে হাস্তাস্পদ হতে হবে। বছর কতক উপাধির ছাত্র পাশ করাও দেখি তখন চেষ্টা করে দেখ্‌ব।"

"আচ্ছা, এবার জল আহার করেও উপাধির ছাত্র রাখ্‌ব।"

এই সময়ে খানসামা চা লইয়া উপস্থিত হইল। সুরমা এক এক কাপ টেবিলের উপর দিয়ে গেল।

মাধবী বলিলেন—"সুরমা তোমার কাকার জন্যেও এক কাপ দেও।"

"করেন কি বৌঠাকরুণ, আমি কি চা খাই? ওটা যে ম্লেচ্ছের খাদ্য।"

"চা ম্লেচ্ছের খাদ্য কি করে হল? তোমার দাদাও ত খেয়ে থাকেন।"

"হাঁ তা বটে তা বটে, ওটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যবহার নেই কিনা তাই ঐ কথাটা বেরিয়ে গিয়েছে। শাস্ত্রে উহার নিষেধ ত দেখা যায় না। এ গাছের পাতা বইত নয়, পাঁচন ত আয়ুর্ব্বেদে

ব্যবস্থাই আছে। আর এই চা ত এ দেশেই জন্মায়। তখন আর দোষ কি হতে পারে? তা দেন একটু খাই; পাঁচন ত খেয়েই থাকি।"

নরেশ বাবু বলিলেন—"ফটিক, তোমার মনে যদি খটকা হয় তবে খেয়ে কাজ নেই।"

"না দাদা, আপনি যখন খাচ্ছেন তখন কোন দোষই হতে পারে না।"

চা পান করিতে করিতে মাধবী নরেশ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো বল্‌ছিলেন—হিন্দু শাস্ত্রে সধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা আছে।"

"কি ফটিক কোন শাস্ত্রে বিধান আছে?"

"আজ্ঞে না—তবে ঐ শ্লোকটা বল্‌ছিলাম।"

"কোন শ্লোকটা?"

মাধবী—"ঠাকুরপো, ভয় কর্‌ছ কেন? ওঁকে শ্লোকটা শুনিয়ে দেওনা।"

ফটিক—"হাঁ—হাঁ—ঐ যে—ঐ যে—

মাধবী—"ঐ যে নষ্টে মৃতে—।"

নরেশ,—"ওঃ বুঝেছি মেয়েদের মাথা বুঝি বিগড়ে দিচ্ছ? বিদ্যাসাগর মহাশয় কি বিধবা বিবাহ চালাতে পেরেছেন? ঐ শ্লোকের প্রতিবাদ গুলোকে পড়ে দেখেছ? যে স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করে তাকে কি সাধ্বী স্ত্রী বলা যেতে পারে?—"ন দ্বিতীয়শ্চ

সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে”—এর অর্থ কি? কোন শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের উপদেশ আছে, বল্‌তে পার? তবে যদি কোন নারী দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণ করে, তাকে সাধ্বী বলা যেতে পারে কি? কোনও পুরাণে দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের ব্যবহার দেখেছ কি? যাহা কোন কালেই হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, তা তোমরা গায়ের জোরে চালাতে পার; কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে চালিও না, এই আমার অনুরোধ।”

ফটিক,—“আজ্ঞে তা বটে—তা বটে—”

মাধবী—“কেন ঠাকুরপো আম্‌তা আম্‌তা কর্‌ছ কেন? তুমি ত অকাট্য প্রমাণই দিয়েছ। উনি কি আমাকে তাড়া দিয়ে চুপ করাতে পার্‌বেন মনে কর? উনি আমাদের সঙ্গে তর্ক করুন না কেন। উনি বল্‌ছেন সধবা বা বিধবার পুনরায় বিবাহ কোন পুরাণে ব্যবহার দেখা যায় না। নাই থাকল ব্যবহার, শাস্ত্রে ত বিধান আছে। পুরুষেরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহারে আন্‌তে দেয়নি, এখন আমরা ব্যবহারে আনব। উনি বল্‌ছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ চালাতে পারেন নি। তা যে স্বার্থপর পুরুষদের জন্য সে বিষয়ে কি আর কিছু সন্দেহ করবার আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্লোকের যে অর্থ করেছিলেন তার অনেক প্রতিবাদ হয়েছিল। প্রতিবাদ ত হবেই। আজ পর্য্যন্ত নারীকে যে অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে তার কোনটার প্রতিবাদ হয় নি? উনি বল্‌ছেন নারী পত্যন্তর গ্রহণ কর্‌লে সে

সাধ্বী পদবাচ্যা হবে না ; না হয় নাই হবে। পুরুষেরা বহু বিবাহ করেও যদি সাধু পদবাচ্য হতে পারে—তবে নারীও পত্যন্তর গ্রহণ করে নিশ্চয়ই সাধ্বী বলে গণ্য হবে। পুরুষের এই দুর্দ্ধর্ষ শাসনের বিরুদ্ধে আমাকে অভিযান কর্‌তেই হবে ও নারীর ন্যায্য অধিকার আমাকে অর্জ্জন করে নিতেই হবে।" •

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

মাধবী কুমুদকে যে পত্র দিয়াছিলেন—তাহার সে যে উত্তর দিয়াছিল সেই পত্রখানি তিনি নরেশ বাবুকে দেখাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল—"সুরমাকে বিবাহ করিয়া আমি যে ভুল করিয়াছি তজ্জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার বিশ্বাস ছিল স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনীই হইবে। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার আমাদের মানিয়া চলিতেই হইবে। আপনি আমার জননীর অশেষ নিন্দা করিয়াছেন, ইহা আপনার সদ্বিবেচনার পরিচায়ক হয় নাই। তিনি তাঁহার পুত্র বধুর জন্য আবাল্যের সংস্কার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুরমার উচিত ছিল তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা, কিন্তু সে তাহা পারে নাই। আমি তাহার ব্যবহারে নিরাশ হইয়াছি। ততোধিক ব্যথিত হইয়াছি আপনার এই পত্রখানি পাইয়া। আমার আর বলিবার কিছুই নাই। আপনি সুরমার পুনরায় বিবাহ দিতে চান, তাহাতে আমার কোনও আপত্তিই নাই। আপনার প্রস্তাব মত কোন কার্য্যই আমি করিতে সক্ষম নহি। মাতৃ-আজ্ঞা আমি

সর্ব্বক্ষণ পালন করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সুরমা যদি ইচ্ছা করে সে বিবাহ করিতে পারে। আমি তাহাতে কোন বাধা উৎপাদন করিব না। আমি আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী জননীর আদেশ অনুসারে আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে আজ হইতে আপনাদের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম। আশা করি পুনরায় পত্র লিখিয়া আমাদের শান্তি ভঙ্গ করিবেন না।"

নরেশ বাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন—"কেমন হ'ল ত? সে আর আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে চায় না।"

মাধবী—"তাতে আমি ত হেঁচে বেঁচে গেলাম। তার জবাব ত পেলে, এখন সুরমার বিয়ের ব্যবস্থা কর্‌তে আর বাধা থাক্‌ল না। চুপ করে রইলে যে?"

"আমি আর কি করব? তোমরাই ব্যবস্থা কর গে। আমি যাকে একবার দান করেছি, তাকে ত আর পুনরায় দান কর্‌তে পারি নে।"

"ওঃ বুঝেছি! Servitude আর কাকে বলে? মানুষকেও কি দান বিক্রয় করা যায়? হাওয়ার্ড, তুমি ফিরে এস! তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি! সম্পেসন তুমিও ফিরে এস! তোমরা জগতের দাসত্ব ঘুচিয়েছ শুনেছিলাম, কিন্তু হিন্দুনারীর দাসত্ব ঘুচেছে কই? হায় হিন্দুনারী! তোমরা বড়ই দুর্ভাগিনী! তোমরা এখনও পিতার সম্পত্তির মধ্যে গণ্য আছ! তোমরা

এখনও—এই বিংশ শতাব্দীতেও দান বিক্রয়ের যোগ্যাই আছে! অধিকার! যে জাতি তার স্ত্রীকে অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়, সে চায় অধিকার—সে চায় স্বরাজ?"

"মাধবী, ওরূপ উত্তেজিত হয়ো না। আমি স্ত্রীজাতির অধিকার লাভেরই পক্ষপাতী।"

"সত্য বলছ?' না আমাকে স্তোক বাক্যে ভুলাতে চেষ্টা করছ?"

"না আমি সত্য কথাই বলছি।"

"বেশ, তবে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর।"

"দেখ, মেয়ে এখন বড় হয়েছে, তার জ্ঞান বুদ্ধিরও স্ফুরণ হয়েছে। এখন তাকে নিজেই পাত্র নির্ব্বাচন করতে দেওয়া উচিত।"

"বেশ তাই তাকে বলব। কিন্তু এ পোড়া হিন্দু সমাজে সহজে ত কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। এখন পুরাপুরি ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে পড়। ঐ সমাজটা যাই হয়েছিল তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অত্যাচার থেকে আশ্রয় পাবার একটা উপায় হয়েছে।"

"দেখ মাধবী, হঠাৎ ব্রাহ্ম সমাজে এখন ঢুকে কাজ নেই। এখন থেকে ব্রাহ্মদের সঙ্গে একটু বেশী বেশী মিশতে থাক। তোমার ত অনেক ব্রাহ্মিকা বন্ধু আছেন, তাঁদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখাশুনা করতে আরম্ভ কর। তারপর সুবিধামত প্রয়োজন হলে দীক্ষিত হলেই চলবে।"

"না—যা করতে হবে তাতে বৃথা সময় ক্ষেপ করে লাভ কি? হিন্দুধর্ম্মে থেকে কেবল এই সব সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হবে বইত নয়, আমি তা কখনই পারব না। দেখ দেখি সুরমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার হচ্ছে।"

"মাধবী, তুমি একটু স্থির ভাবে চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে তুমি অত্যাচারকে যত বড় করে ধরেছ, তত অত্যাচার বোধ হয় হয়নি। তুমি আর ওরকম করে সুরমার মাথা বিগড়ে দিও না।"

"কী, আমি সুরমার মাথা বিগড়ে দিলাম? আমি আর তোমার সংসারে থাকতে চাইনে। আমি একটা গার্ল স্কুলে হেড মিসট্রেসের কাজ অনায়াসেই জুটিয়ে নিতে পারব। আমি কারও ক্রীতদাসী হয়ে থাকব না। সুরমাও যে একটা শিক্ষয়িত্রীর কাজ যোগাড় করে নিতে পারবে না তাও নয়। আমরা দুজনেই চলে যাব।"

"অত রাগ কর কেন? এতে কি সংসার সুখের হয়?"

দাসীবৃত্তি করে আর সুখী হতে চাইনে। আমি চাই স্ত্রীজাতির মুক্তি—Female Emancipation—তার জন্য আমি নিজের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।"

"তুমি স্ত্রীজাতির মঙ্গলের জন্য যা করতে ইচ্ছা কর, তা অনায়াসে করতে পার। তাতে আমি কোনও বাধা দেব না—আমি স্ত্রীজাতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, আমি

এও স্বীকার করি—যে নারীর শিক্ষা হওয়া আবশ্যক ও স্বাধীন উপার্জ্জনের যোগ্যতাও থাকা চাই। প্রয়োজন হলে তারা সন্তানগণের ভরণপোষণের ভার নিতে সক্ষম হয়। তবে নারীর যা কর্ত্তব্য তা থেকে অন্য পথে গিয়ে পুরুষের বিদ্রোহী হওয়াও উচিত নয়। সংসারের ভার নারীরই লওয়া উচিত; নতুবা সংসারে শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। পুরুষ যদি অন্যায় রূপে নারী নির্য্যাতন করে তবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নারী ব্যতিত পুরুষ যখন অসম্পূর্ণ তখন নারীকে হীন মনে করা পুরুষের অকর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষিরা নারীকে হীন মনে করতেন না, তাদের দেবী বলেই মনে করতেন। কতকগুলি সামাজিক ব্যবহার দোষে নারীকে যে হীন করে রাখা হয়েছে—এ আর্য্যঋষিদের অনুমোদিত নয়।”

“তুমি যদি স্ত্রীজাতির প্রতি সানুকূল হবে তবে নিজের কন্যার এই অপমান দেখে নীরবে সহ্য করছ কি করে?”

“আমি সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করাটা পছন্দ করিনে।”

“ওই ত আমার জাতির দোষ। অপ্রকাশ্যে যা ইচ্ছা তাই করব আর সমাজের কাছে গিয়ে ভাল মানুষটি হয়ে দাঁড়াব। হিন্দু আজ সৎসাহস হারিয়েছে বলেই পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছে।”

“দেখ, আমাকে কি তোমার চিনতে বাকি আছে? আমি কি কখন বাহ্যিক ভণ্ডামী করে থাকি? আমি যা করি তা আমি

কারও নিকট বল্‌তে দ্বিধা বোধ করিনে। প্রকৃত কথা কি আমি এখনও হিন্দু ধর্ম্মের উপর আস্থা হারাইনি। হিন্দু ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি তোমাকে বুঝাতে পার্‌লে তুমিও বুঝ্‌বে এই ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায়? পুতুল পূজা করে বলে যারা এই ধর্ম্মকে নিন্দা করে তারা নিতান্তই ভ্রান্ত। এই ধর্ম্মের উপরি দিয়ে কত ঝড় যে বয়ে গিয়েছে তা বর্ণনাতীত। জগতে যত ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে, সে সকলের মূল বিষয়গুলি হিন্দুধর্ম্মের বাহিরের কিছুই নয়। আজ কাল অনেক প্রধান প্রধান ব্রাহ্ম হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছেন।"

"কারও যদি মতিভ্রম হয়, তাতে সাধারণের কি ক্ষতি হয়ে থাকে?"

"তা নয়, স্রোত যে ফিরেছে, তা এ হতেই বুঝা যায়। তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে ঢলে পড়েছ, সে তোমার একটা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কিন্তু তুমি কি জাননা ব্রাহ্মদের অনেক সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার পাত্রাভাবে বিয়ে হচ্ছে না।"

"পাত্র জোটে না বলে অবিবাহিতা রয়েছে তুমি মনে কর? তারা দাসীবৃত্তি কর্‌তে চায় না বলেই বিয়ে করেনি। তারা স্বাধীন জীবন যাপন কর্‌তে চায়, তাই।"

ব্রাহ্মিকাদেরও যদি স্বামীর দাসীবৃত্তি কর্‌তে হয় তবে ব্রাহ্ম হয়ে লাভ কি?"

"তারা ত এমন গোঁড়া নয়, তারা ত ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা কর্‌বে না। তোমার হিন্দুরা কি তাদের মত উদার?"

"স্ত্রী যদি স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হয়ে স্বামীর আচার মেনে চলে তাতে ক্ষতি কি? প্রথম প্রথম একটু বাধ বাধ ঠেক্‌তে পারে; পরে অভ্যাস হয়ে গেলে তার কোন অসুবিধাই ভোগ কর্‌তে হয় না।"

"স্ত্রী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হবে আর স্বামী স্ত্রীর অনুবর্ত্তী হবে না কেন? নারী পুরুষের চেয়ে কিসে হীন?"

নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন একথা আমি বল্‌ছিনে, তবে নারী যে পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল এটা তুমি স্বীকার কর কি?"

"নারী যে দুর্ব্বল একথা আমি মোটেই স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নই। পুরুষেরা স্মরণাতীত কাল থেকে স্ত্রী জাতির উপর প্রভুত্ব করে আস্‌ছে, তাই নারী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তারা যদি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পায় ও ব্যায়াম চর্চ্চা করে তবে তারা কেন পুরুষের সমকক্ষ হবে না?"

"আচ্ছা, জীবের মধ্যে ত স্ত্রী জাতির উপর পুং জাতির কোন আধিপত্য নেই, তবে জীবের মধ্যে পুং জাতি স্ত্রী জাতি অপেক্ষা বলশালী হয় কেন? মনে কর হস্তীর সহিত হস্তিনীর বলের তুলনা হয় কি? হনুমানের সহিত হনুমনীর, শূকরের সহিত শূকরীর, বিড়ালের সহিত বিড়ালীর—আর কত তোমাকে দেখাব?"

"না হয় পুরুষকে বলশালী বলে স্বীকার কর্‌লাম। তাই বলে কি তারা স্ত্রী জাতির প্রতি অত্যাচার কর্‌বে?"

"অত্যাচার কর্‌বে কেন? স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শক্তি

অনুসারে পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য আছে। প্রত্যেকে আপন আপন কর্ত্তব্য করে গেলে আর কোন গোলযোগ হয় না। ঈশ্বরও তাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য কতক কতক নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন।"

"তাই বুঝি ঈশ্বর হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষের সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে, স্ত্রীজাতির প্রতি কঠোর ব্যবস্থাগুলি নিজ হাতে লিখে দিয়ে গিয়েছেন?"

"তা নয় সন্তান প্রসব করা ও সন্তান পালন এ ব্যবস্থাটাও কি পুরুষে করেছে?"

"তোমাকেত আর পারবার যো নেই, তুমি কেবলই প্রতিপন্ন করতে চাও স্ত্রীজাতি পুরুষের গোলামী করবার জন্যই জন্মেছে। আমি দেখিয়েদেব স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল নয়। ব্যাঘ্রী ব্যাঘ্র অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। মানুষের মধ্যেও কোন কোন স্থানের মেয়েরাই অধিক কর্ম্মপটু। আমি স্ত্রীজাতির মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসিনী হব ও দেশে দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচার করব।"

"তোমার যদি তাই ইচ্ছে হয়ে থাকে, করতে পার। তোমার স্বাধীনতায় ত আমি হস্তক্ষেপ করব না।"

"তুমি হস্তক্ষেপ করলেই কি আমি শুনব? আমি ত আর অক্ষম মেয়ে নই যে আমাকে তোমার দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে।"

"আমি কি তোমাকে ভালবাসি না? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কখন কোন কাজ করি? তার প্রতিদান

স্বরূপ তোমার কাছে কি একটুও ভালবাসা পাইবার অধিকারী নই?”

“কী আমি তোমাকে ভালবাসিনা? আমার হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসার বিনিময়ে এই নিষ্ঠুর সন্দেহ। আমি তোমাকে কিরূপ ভালবাসি তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নিশ্চয়ই জানছেন। হায় ভগবান্। আমার অকৃত্রিম ভালবাসার কি এই পুরস্কার হল?”

“মাধবী তুমি যে আমাকে আন্তরিক ভালবাস তা কি আমি বুঝি না? কিন্তু বল দেখি তুমি যে সন্ন্যাসিনী হয়ে আমাকে ছেড়ে যাবে বল্লে তাতে আমার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লেগেছে। তুমি বলে গেলে আমি কি করে এ সংসারে থাকব? আর বল দেখি তুমিই বা কি করে আমাকে ছেড়ে থাকবে?”

“দেখ তা আমি সকলই বুঝি, কিন্তু যদিও তোমার সহিত বিচ্ছেদের কথাটা ভাবতেও আমার বুকটা কেঁপে উঠে। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি তাতেও প্রস্তুত।”

“দেখ স্ত্রী পুরুষের সহযোগেই সুখী হওয়া যেতে পারে বিরোধে নয়। এখন পুরুষরাও বুঝতে পেরেছেন যে স্ত্রী জাতির প্রতি অবিচার হচ্ছে তাই আমাদের সমাজের শিক্ষিত নেতারাও নারীকে ক্রমে ক্রমে অধিকার দিচ্ছেন। স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী; একজনকে ছেড়ে দিলে অন্যে পূর্ণ বলে অভিহিত হতে পারেন না। তোমার মত স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। তোমাকে পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।”

"তোমার মত গুণবান পতিই বা কয়জনের ভাগ্যে জোটে। আমাদের দাম্পত্য জীবনের সৌভাগ্যের তুলনা করতে গেলে আমিই জয়লাভ করব। আমি চেয়েছিলাম সুরমাও আমার মত সুখী হয়, কিন্তু তা হল না। আমি বড় হতাশ হয়ে পড়েছি। কি করে মেয়েটাকে সুখী করব তাই ভেবে ভেবে আমার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে তাও আমি অনেক সময় বুঝতে পারি।"

"দেখত ঠাকুর আজ এত বিলম্ব করছে কেন? ক্ষুধাটা একটু বেশী পেয়েছে। রান্নার কি বিলম্ব দেখ দেখি?"

"রান্না বোধ হয় হয়েছে, ততক্ষণ এক গ্লাস সরবৎ দেব কি?"

"রান্না যদি হয়ে থাকে তবে আর সরবৎ দিতে হবে না।"

মাধবী রন্ধনশালায় চলিয়া গেলেন। নরেশবাবুও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"সুরমা, ঐ যে যতীন নামে নূতন ব্যারিষ্টারটি কর্ত্তার কাছে যাতায়াত কর্‌ছে, ঐ ছেলেটি কেমন সভ্য ও মিষ্টভাষী?"

"মা, দুইচার দিনে কি মানুষ চেনা যায়?"

"কেন চেনা যাবে না? ওর কি রকম এটিকেট্ দোরস্ত তা কি লক্ষ্য করেছিস্?"

"না মা, আমি অত লক্ষ্য করিনি।"

"আচ্ছা সে আজ আবার আস্‌বে, আজ তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখিস্। ছেলেটি বড়ই ভাল এবার সে ব্যারিষ্টারীতে প্রথম হয়েছে।"

"মা আমার মনে হয় ব্যারিষ্টারীতে প্রথম হয়ে বাবুটির যেন বেশ একটু অহঙ্কার হয়েছে।"

"তুই কি করে তা বুঝ্‌লি? আমিত কোন অহঙ্কারের গন্ধ পর্য্যন্ত পাইনে। কেমন শান্তশিষ্ট, আমাকে মা বলে ডাকে। ওকে আমার বড়ই ভাল লাগে। তার যাতে ভাল হয়—তা আমাকে

করতেই হবে। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি—যে, সে যে সকল মোকর্দ্দমায় Engage হবে সেগুলি একটু মনোযোগের সহিত শুনতে। ওর যাতে শীঘ্র পসারটা জমে যায় তা অবশ্য করতে হবে।"

"তোমাকে মা বলেছে, আর তুমি গলে গিয়েছ। কিন্তু বাবাকে পক্ষপাত করবার জন্য অনুরোধ করা কি উচিত?"

"পক্ষপাত আর কি? তার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখলেই বুঝি পক্ষপাত করা হল?"

"বাবা কি তাতে স্বীকৃত হয়েছেন?"

"তিনি কি কোন কথার সোজা উত্তর দেন? তাঁর কেবল প্যাঁচোয়া কথা।"

"না মা, তিনি যে কাজটা করবেন তার স্পষ্ট উত্তরই দিয়ে থাকেন। আর যে কাজটা তাঁর করবার ইচ্ছা নেই, সেইটার সময় ঐরূপ ঘুরিয়ে উত্তর দেন।"

"ঘুরিয়ে উত্তর দিলেই কি আমি ছাড়ব? আমার কথামত কাজ তাঁকে দিয়ে করাব তবে ছাড়ব। কাল রবিবার, আমি যতীনকে কাল খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করব, তোকে কিন্তু তাকে গান শুনাতে হবে।"

"মা আমি কি করে গান শুনাব?"

"কি করে আবার গান শুনাবি? যেমন করে গান করে থাকিস্।"

"আমি যে গান শোনাতে পারব তা আমার মনে হচ্ছে না।"

"কেন গান করতে পারবি নে। তোর এমন সুন্দর গলা সে একবার শুনে যাক।"

"মা, আমার যে বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে আমি গান গাইতে পারব না।"

"বাঃ! আমি তাকে নিমন্ত্রণ করব, আর তুই তাকে গান শুনাবি নে, এত খরচ পত্র করে তোকে গান শিখান হয়েছিল কি জন্যে?"

"সকল সময় কি গান ভাল লাগে?"

"তা বল্লে হবে কেন? যতীনের সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ করে নে। তোর গান শুনলে কে না মোহিত হয়? যতীনের এখনও বিয়ে হয়নি। এখন তার সঙ্গে তোর আলাপ হয়ে গেলে সে নিশ্চয়ই তোকে ছেড়ে আর কাওকে বিয়ে করতে পারবে না। তোর বিয়েটা দিতে পারলে, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"তুমি আর বিয়ের প্রস্তাব করোনা মা। পুনরায় বিয়ে করতে আমার মোটেই প্রবৃত্তি নেই।"

"সে কি কথা? কুমুদ যে তোকে অপমান করে ত্যাগ করল, সেই অপমান সয়ে আমাদের থাকতে হবে?"

"কি করব মা, আমার যে পুনরায় বিয়ের কথা মনে হলেই কান্না পাচ্ছে।"

"ও রকম ত হয়েই থাকে। এ রকম বিয়ে ত আর সুখের নয়। বিয়ে হয়ে গেলে আর মন খারাপ থাকবে না।"

"না মা, আমি আর বিয়ে করতে পারব না।"

"কেন বিয়ে কর্তে পারবি নে? তবে যা কুমুদের পা ধরে কাঁদ্‌গে। হিন্দু মেয়েদের slave-mentality কত দিনে যে ঘুচবে, তা বুঝতে পারছিনে। দেখ্‌ পুরুষেরা স্ত্রী-জাতির উপর কিরূপ অত্যাচার করে আসছে—তা কি তুই বুঝতে পারছিস্‌ নে? আমি দেখাতে চাই—নারী পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়, আর নারীর অধিকার পুরুষেরই সমান হবে। পুরুষেরা ইচ্ছামত বিয়ে কর্‌বে আর নারী স্বামী মরে গেলেও বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না। এই পক্ষপাতমূলক শাস্ত্র মেনে চলা ঘোর অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া নয় কি?"

"তা বটে মা, কিন্তু পুরুষেরা যদি একটা অন্যায় করে, তাই বলে নারীকেও যে সেই অন্যায় কার্য্যটি কর্‌তে হবে—এটা কি তুমি ঠিক বলে মনে কর?"

"বিয়ে করা অন্যায় হল কি করে?"

"পশুভাব ও অসংযম মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেয়।"

"পুরুষের পক্ষে অসংযম কি শোভন হবে?"

"তা কি কখন হতে পারে?"

"তবে তাদের অন্যায়ের জন্য আমরা প্রতিশোধ নেব না কেন? আর একটা আদর্শ দেখাতে হবে ত? সমাজ সংস্কার

করতে হ'লে নিজেদেরই আদর্শ হতে হয়, শুধু বক্তৃতায় কাজ হয় না।"

"মা, প্রতিশোধ লওয়াটা কি খুব ভাল কাজ বলে মনে কর? ক্ষমাগুণই মানুষকে মনুষ্যত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।"

"তাই বুঝি একজন অনায়াসে ত্যাগ করে বসবে আর অপরে তা সহ্য করে চুপ করে বসে থাকবে। এরূপ করলে সমাজ শাসিত হবে কি করে? একজন খুন করবে আর একজন ক্ষমা করে তার প্রতিশোধ নেবে না। এরূপ করলে অপরাধের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে যাবে। রাগ হলেই যদি ত্যাগ করে বসে তবে সে রকম স্বামীকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

"মা তুমি যে ভাবে পত্র লিখেছিলে, তাতে তাঁরা আমাকে ত্যাগ না করে আর কি উত্তর দিতে পারেন। সেই পত্রের উত্তরে তাঁরা যা লিখেছিলেন সেটা যে তাঁদের অন্তরের কথা এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।"

"তাদের পূর্ব্ব ব্যবহারটা কি ত্যাগ করার মত নয়?"

"একটু চিন্তা করে দেখ মা, অধৈর্য্য হয়ে হঠাৎ কোন কাজ করা উচিত নয়। আমার শ্বশুর বাড়ীর আচার ব্যবহার ও আমাদের বাড়ীর আচার ব্যবহার আকাশ পাতাল প্রভেদ, কাজেই হঠাৎ সেখানে গিয়ে আমার মনটা ভয়ানক বিদ্রোহী হয়ে পড়েছিল। প্রথমে আমার শাশুড়ী আমাকে স্নেহের চক্ষেই দেখে-

ছিলেন। তাদের সঙ্গে এই যে একটা মস্ত ব্যবধান হয়ে গিয়েছে, এর জন্য আমার হঠকারিতাই অধিক দায়ী।"

"তা হলে তাদের দোষ ছিল না, আমাকে মিথ্যা বলে উত্তেজিত করেছিস্?"

"না—মা, ঘটনাগুলো যা ঘটেছিল সবই ঠিক বলেছি।"

"সেই সকল ঘটনায় কি বুঝায়? তোর অবমাননা ও আমাদের কুৎসা করা বুঝায় নাকি?"

"তা কি আর মোটেই বুঝায় না? মা, কি বল্ছিস?"

"তবে তোর আর কি বল্বার আছে বল্?"

"আমার শাশুড়ী আমাকে যদি কোন অপমান করেন, সেটা অত গুরুতর ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া ঠিক কি? গুরুজনের শাসন ত প্রত্যেকেরই মেনে নেওয়া উচিত।"

"অন্যায় করলে গুরুজন বল্তে পারে, কিন্তু অন্যায়রূপে বল্বে কেন? তুই এমন কি অপরাধ করেছিলি যার জন্য তারা তোর উপর খড়্গহস্ত হয়েছিল?"

"তা ত তোমাকে বলেছি। আমি সেখানে গিয়ে দেখ্লাম—আমাদের বাড়ীর আচার ব্যবহার খাওয়া-দাওয়ার সহিত সেখানকার কিছুই মিল নেই। পুরাতন ইটবেরকরা বাড়ীটা দেখে প্রথমেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেই ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখি ঘরগুলি মোটেই জমাট করা নয়। ছোট ছোট জানালাগুলি দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আস্বার উপক্রম হ'ল। তার পর

প্রাতে উঠে দেখ্‌লাম—চায়ের বন্দোবস্ত নেই। মনে কর্‌লাম—খানকতক বিস্কুট খাই। বিস্কুটের বাক্সটা খুলে যেমন খেতে যাব এমন সময় শাশুড়ী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও বল্‌লেন—বিস্কুট খেলে কোন জিনিষই আমার ছোঁওয়া তিনি নেবেন না। তখনই আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে সেই ঘোলা জলে স্নান করিয়ে আন্‌লেন। স্নান করে আস্‌তেই আমার নাক দিয়ে জল ঝর্‌তে আরম্ভ হল! তার পর দিনই জ্বর হয়ে পড়্‌ল। মনটাও বড়ই খারাপ হয়ে পড়্‌ল। খাটের উপর শুয়ে আমি দেখ্‌লাম পার্শ্বের দেওয়ালের ফাঁক থেকে একটা বিছে মুখ বাড়াচ্ছে। তাই দেখে ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল। আমার মনে হতে লাগ্‌ল—কত যে সাপ ও বিছে সেই বাড়ীর দেওয়ালে বাসা বেঁধে আছে তার ঠিক নেই। প্রতি পাদবিক্ষেপে সাপ বা বিছের ঘাড়ে পা দিচ্ছি বলে মনে হতে লাগ্‌ল। একদিন রান্নাঘরে কাঠের মাঝে একটা সাপের খোলস বেরিয়ে পড়্‌ল। তাই দেখে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—এমন সাপ বিছের আড্ডা লক্ষ্মীছাড়া বাড়ীতে আমি বাস কর্‌তে পার্‌ব না।"

"এ আর তুই কি অন্যায় বলেছিলি? সেই সাপ বিছের আড্ডায় তারা থাকে কি করে?"

"আমার শাশুড়ী সেই কথারই উত্তর আমাকে দিলেন। তিনি বল্‌লেন—যে তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে এসেছ, তুমি এমন কথা বল্‌লে? আমরা ত চিরকালই এই বাড়ীতে বাস কর্‌ছি।

এ একটা চিতি সাপের খোলস বই ত নয়। আমিও একদিন বৌ হয়ে এই বাড়ীতে এসেছিলাম, কিন্তু আমাকে ত সাপে বিছের খেয়ে ফেলেনি। তুমি লেখা পড়া জান, বয়েসও হয়েছে, কৈ তোমার বুদ্ধি ত সেরূপ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ঐ কথা বলে তুমি আমার ছেলের অপমান করলে। ছেলের চেয়ে ত আর বৌ বড় নয়। আর সেই ছেলেই আমার এই বাড়ীতে বাস করে খাটের এত বড়টি হয়েছে।"

"তাই ত তোর শাশুড়ীর কি অহঙ্কার? তার ছেলে হল ভিখারীর ছেলে; আর আমার মেয়ে হল জজের মেয়ে। সে মাগী পাঁচুঠাকুর আর পঞ্চাশেলা দুই সমান করতে চায়? আমার মেয়ে কি কোনকালে ঐ রকম হাড়্হাবাতে ঘরে বাস করেছে? ঐ ঘর কি আর তারা ভাল করতে পারবে তুই মনে করিস্? যদি ওকালতি করত তা হলেও একদিন আশা করা যেতে পারত। গেল কিনা চাষ করতে। চাষে যা হবে তাত জানি। আমাদের মহেন্দ্রের সম্বন্ধী চাষ করে দেনদার হয়—শেষে বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত নিলামে বিক্রী হয়ে গেল। এদেরও তাই হবে। শেষে দুই মা বেটায় কুঁড়ে ঘরে বাস করতে হবে। তোকে কি আমি সেই কুঁড়ে ঘরে বাস করতে পাঠাব মনে করিস্?"

"তাঁদের হাতে যখন আমাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়েছ, তখন আমাকেও তাঁদের সেই কুঁড়ে ঘরেই বাস করতে হবে বই আর কি?"

"আমরা কি তোকে বেচে খেয়েছি যে তোকেও তাদের সেই কুঁড়ে ঘরে বাস করতে যেতে হবে? তাদের দুর্বুদ্ধির জন্য তারা ফল ভোগ করুকগে। আমি তোর ফের বিয়ে দেব।"

"না—মা বিয়ে মানুষের একবার বই আর হয় না। পুরুষেরা যে দুই তিনটা বিয়ে করে—তাদের তা করাও উচিত নয়। শ্রীরামচন্দ্র ও পুরুষ ছিলেন—তাঁর ত আর দুটো পাঁচটা বিয়ে করবার বাধা ছিল না, তবে তিনি করেন নি কেন? যাদের মনুষ্যত্ব আছে তাঁরা কখনও এরূপ কাজ করেন না।"

"কেন—ইউরোপ ত সভ্যদেশ—তারা কি করে?"

"তারা করুকগে, ক্রমাগত ডাইভোর্স করা ও একজনকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিয়ে করা, এটা পশু ভাবেরই পরিচায়ক। এতে মানুষের মনুষ্যত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ওতে বিয়ের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। আমার মনে হয় যে ঐরূপ বিয়ের দ্বারা ব্যভিচারকে বৈধ করে নেওয়া হয় মাত্র। ওরূপ ঘৃণিত কাজ আমি করতে পারব না।"

"ইউরোপীয় সভ্য জাতি যা করে সেটা নিন্দনীয় হল আর এই অসভ্যবর্বর দেশ যা করে সেইটেই তোর কাছে ভাল হল। তোদের যা মন চায় তাই কর। তোরা সব একজোট হয়েছিস্। আমার মতে ত কোন কাজ হবে না, তখন আমি আর তোদের কোন কথার মধ্যে থাকব না। আমি ত তোর অপমান ও দুঃখ দেখে সহ্য করতে না পেরে, তোর বিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম; তুই

যখন আমাকে অপমান করতে উদ্যত হয়েছিস্, এখন আমি আর প্রতিশোধ নিতে চাইনে।"

"তুমি যে ভাবে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ তার ফল হয়ত বিষময় হতে পারে।"

"তুই ত আমাকে উত্তেজিত করেছিলি, তোর যদি এতই জ্ঞান ছিল তবে, ঐরূপ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলি কেন?"

"মা, তখন আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি আমার পুনরায় বিয়ে দিতে চাইবে।"

"কেন পুনরায় বিয়ে করলে কি ক্ষতি হবে? পুরুষদের পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থাই মেনে নিতে হবে?"

"তুমি যার সঙ্গে ফের বিয়ে দেবে সেও যে ভাল ব্যবহার করবে তার নিশ্চয়তা কি? বরং এখন যদি আমি আমার শাশুরীর অনুবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পারি তাহলে হয়ত সুখী হতে পারব।"

"আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছি—স্ত্রীজাতির যে দুর্ব্বলতা তাই তোর এসেছে। এই দুর্ব্বলতার জন্যই ত পুরুষেরা স্ত্রীর প্রতি এরূপ অত্যাচার করতে পারে। নারী যদি শক্ত হতে পারত তবে পুরুষকে নিশ্চয়ই অবনত হতে হত। কিন্তু তারা ত তা হবে না, পুরুষেরা একটু বেঁকে বসলেই তারা কেঁদে পায়ে ধরবে আর পুরুষেরা মনে মনে হাসবে ও নিজেদের প্রভুত্বের আসন দৃঢ় করে নেবে। স্ত্রীজাতি যদি মুক্তি চায় তবে পুরুষের সঙ্গে

তাদের অসহযোগ করতেই হবে। বেশ তুই যদি বিয়েই করতে না চা'স্ তবে আমার সঙ্গে লেগে পড়্। আমরা দুজনে মিলে সভা সমিতি করে পুরুষের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করি।"

"মা, এ রকম আন্দোলন চালাবার সময় এখনও আসেনি। প্রথমে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার আবশ্যক। নারী শিক্ষিতা না হলে, তোমার উপদেশ কয়জনে শুনবে? তোমাকে শেষে উপহাসের পাত্রী হতে হবে।"

"তা হতে হয় হব। স্ত্রীজাতির মঙ্গলের জন্য আমি তা সহ্য করতে প্রস্তুত। এখন তুই আমার সঙ্গে যোগ দিবি কিনা তাই বল্?"

"মা, আমার যে তোমার মত মনের বল নেই।"

"কী! পারবি নে? আমার পেটে জন্মে তোর এত দুর্ব্বলতা? হায় দুর্ভাগা হিন্দুনারী! পারলাম না! তোদের দাসীত্ব থেকে মুক্ত করতে পারলাম না! একতার একান্ত অভাব, আর সেই একতাই অসম্ভব। আমার গর্ভজাত কন্যাই যদি আমার বিদ্রোহী হয় তবে অন্যে আমার মতানুবর্ত্তী হবে, এ বিশ্বাস করা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তোর যা খুসী তাই করগে, আমি আর তোদের কোন কথার মধ্যে থাকব না।"

মাধবী এই কথা বলিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

মাধবী চলিয়া গেলে সুরমা তথায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।—মা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি এখন কি করি? তিনি আমাকে পুনরায় বিবাহ করিতে বলিতেছেন। বাবার নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে পুনরায় বিবাহ করিলে সে স্ত্রী সতী বলিয়া গণ্য হয় না। আমি কি অসতী পদবাচ্য হইব? আমি কি শেষে ঘৃণ্য জীবন যাপন করিব? না তা কখনই পারিব না। যে সকল সমাজে বিধবা বিবাহের প্রথা আছে তাঁদের মধ্যেও অনেকে পত্যন্তর গ্রহণ করেন না। বাস্তবিক পত্যন্তর গ্রহণ গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। তাহার মধ্যে আছে স্বেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা। ব্রাহ্মণগণ যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তাহার মূলে ছিল সংযম ও ত্যাগ। এই দুইটী গুণই একমাত্র জীবকে উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে—আর স্বেচ্ছাচারই জীবকে নিম্নগামী করিয়া থাকে। আমি কি সেই হীন পথে অগ্রসর হইব? যাহারা অসংযমী তাহারা পশুরও অধম। পশুরও আহার বিহারের একটা বাঁধা নিয়ম আছে। আমার স্বামীরই বা অপরাধ

কি ? তিনি মাতৃভক্ত, মাতৃভক্ত পুত্র কখন অসুখী হইতে পারে না। তিনি ত আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন : এখন যে ভাল বাসেন না তাহাই বা কে বলিল ? তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা নষ্ট হইতে পারে না : মা শাস্ত্রের মত স্বীকার করিতে চাহেন না। অধিকার সম্বন্ধে পুরুষের প্রতি পক্ষপাত থাকে বলিয়া আমারও বিশ্বাস কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবস্থা কি সুন্দর—পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্—মা যে সভ্যদেশ ইউরোপের এত পক্ষপাতী, যেখানে বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। হিন্দুদের বিবাহের উদ্দেশ্য ভোগের জন্য নয় পুত্র লাভের জন্য, যে পুত্র পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দান করিবে। কেমন উচ্চ এই idia, ইহাতে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে যৌন সম্বন্ধের প্রাধান্য নাই। ইহাতে উচ্চ ধর্ম্মভাবই বিদ্যমান আছে। পতিপত্নীর সম্বন্ধ পবিত্র প্রণয়ের উপর স্থাপিত হইলে কেহ কাহাকেও ছোট বলিয়া মনে করিতে পারে না। স্ত্রী স্বামীকে যেমন দেবতা বলে জ্ঞান করে তেমনি নারীও দেবী বলিয়া বিবেচিত হয়। এরূপ হইলে অধিকারের দ্বন্দ্ব আসিতেই পারে না। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়। এরূপ পবিত্র আদর্শ দাম্পত্য জীবন কোন দেশে বা কোন ধর্ম্মে দেখা যায় ? আমার স্বামী ত প্রেমময়, আমি যদি তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মাতৃপূজার সহায় হইতাম—তবে আমি প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্যই করিতাম। হায় ! আমি কর্ম্ম দোষে সকলই হারাইয়াছি।

আমার মত গুণবান্ স্বামী কয়জনের আছে। আমি এমন পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের ভোগ্যা হইব? আমার মত নারীকে যে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে সে কেবল ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই লইবে। আমি কি বিলাসীর বিলাস বাসনা চরিতার্থের বস্তু হইব। ইহা অপেক্ষা বেশ্যাবৃত্তি হীন কিসে? পতিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিয়া হিন্দু নারীর যে সুখ তাহা কি অন্য নারীর মধ্যে আছে? না, মার মতে কাজ করিলে আমি নিরয়গামিনী হইব। বাবা ত মার কার্য্য সমর্থন করেন না। আমি পতির অনুগতই হইব। আমি তাঁর চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, তিনি কখনই আমাকে ফেলিয়া ফেলিতে পারিবেন না। আমি শাশুড়ীর আজ্ঞাবহ হইব ও তাঁহার সেবা করিব। তাহা হইলে তিনিও আমাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। জগতে যাহারা নিজেরই সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহারা জীবের শত্রু। তাহারা নিজের সুখের জন্য অপরের সর্ব্বনাশ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। আমি নিজের সুখ খুঁজিব না, আমার স্বামী ও শাশুড়ীর সেবাই আমার জীবনের ব্রত হইবে। যদি পূর্ব্ব অপরাধের জন্য তাঁহারা আমাকে ক্ষমা না করেন তবে অধ্যয়নই আমার জীবনের ব্রত হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

"কুমুদ, এ রকম করে আর কতদিন চলবে? আমি দিন দিন বুড়ো হয়ে পড়ছি, তুই একটা বিয়ে করে ফেল্, আর অমত করিস্ নে। তোর শ্বাশুড়ীর ত রকমটা দেখেছিস্। সধবার বিয়ে ত কোন কালেই শুনিনি। বিদ্যেসাগরের আমলে বিধবা—ষাট্ ষাট্। যাক্ ও সকল কথায় আর কাজ নেই। তুই বাবু একটা বিয়ে করে ফেল্—আমি আর সংসারের ভার নিতে পারব না।"

"মা কেন আমরা মায়ে-পোয়ে ত বেশ আছি, আর উৎপাত জুটিয়ে কাজ নেই।"

"তোকে যে বলেছিলাম, তোর শ্বশুরের টাকাগুলো সুদসহ ফেরত দিতে, তার কি কর্‌ছিস্? তাদের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ ত্যাগ করা হয়েছে, তখন তাদের টাকা ফেরত না দিলে হবে কেন?"

"আসল টাকাটাই পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু শ্বশুর তা ফেরত পাঠিয়েছেন।"

"তা হবে না, তুই ফের পাঠা। তাদের কোন টাকা আমাদের রাখা হবে না। ঘৃণার কথা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা। কোন্ দিন হয়ত শুনব তারা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ঐ কথা শুন্‌বার আগে যদি আমি মরি, তবে আর ঐ কথাটা শুন্‌তে হয় না।"

"মা, কি করে আর ফেরত পাঠাই। শ্বশুরের কাতরতা-পূর্ণ পত্রখানি যদি তুমি শোন, তবে আর ফেরত পাঠাতে বল্‌বে না। তোমার চোখে জল না এসে পার্‌বে না। তিনি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।"

"মেয়ের বিয়ে বুঝি হল না? তাই ক্ষমা চাওয়ার ধুম পড়ে গেল। সে দিন বৌ ক্ষমা চেয়ে পত্র লিখ্‌লেন। আজ তার বাবা ক্ষমা চেয়ে পত্র লিখেছেন। তা হবে না, ক্ষমা-টমা আমার কাছে হবে না। সেদিন বৌকে কাড়া জবাব দিয়ে দিয়েছি।"

"মা শাশুড়ীর দোষেই এই সব হয়েছে। শ্বশুর সদাশিব বল্‌লেই হয়।"

"বেয়াই যে আমার ভাল তা কি আমি জানিনে, তাঁর জন্যই ত আমার দুঃখ হয়। কিন্তু হলে কি হবে, ভদ্রলোক যে বড়ই স্ত্রৈণ। তিনি যদি একটু কড়া হতে পার্‌তেন তা হলে কি তোর শাশুড়ীর অত স্পর্দ্ধা হতে পারে?"

"কিন্তু মা শ্বশুরের জন্যে বড়ই দুঃখ হয়।"

"তা হলে কি হবে বাপু, তোর শাশুড়ীর অহঙ্কার ত যাবে না। সে বৌ নিয়ে ত আমি কখনও ঘর কর্‌তে পার্‌ব না। সেই

মায়েরই মেয়ে ত, আর তার নমুনাও বেশ একটু পেয়েছি : তার মা যখন তার ফের বিয়ে দিতে চায় তখন তাকে কি নিতে আছে। সতীত্বের মর্য্যাদা কি তারা জানে? আমার পুণ্যের সংসারে কি আমি পাপ ঢুকতে দেব? হিন্দুর ঘরের বৌ ত, হিন্দুর ঘরের মেয়ে হয়ে ও রকম কথা মুখে আনতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।"

"তোমার বেয়ানের দোষে তোমার বৌকে ত্যাগ করবে?"

"তুই কি সেই বৌ নিয়ে ঘর করতে চাস্ না কি? তা তুই নিয়ে আসতে পারিস্—তার আগে আমাকে কাশী রেখে আয়। অন্য ধর্মের কথা ভাবলেও পরলোকের মহাপাতক হয়, অথচ তারা সেই চেষ্টাই করছে। এখন তুই স্পষ্ট করে বল্ দেখি—তুই ফের বিয়ে করবি কি না? এবার আমি একটা ভট্চাজ-পণ্ডিতের মেয়ে দেখে নেব।"

"মা, তোমার আজ্ঞা কি আমি কখন অবহেলা করেছি?"

"বেশ তবে এবারও আমার কথা শুনে পুনরায় একটা বিয়ে করে ফেল্।"

"তাই হবে মা।"

"আমি তবে একবার দেশে যাব। এবার কাঁঠাল কি রকম হল সে গুলোর একটা ব্যবস্থা করে তবে আসব। আমরা এখন দেশে নেই—চোরে কি আর রাখবে? এখন গিয়ে সে গুলোর একটা ব্যবস্থা না করলে একটাও পাওয়া যাবে না।"

"কে আর তোমার কাঁঠাল চুরি করতে যাচ্ছে মা? দু'টো দশটা লোকে পেড়ে খেতে পারে।"

"না—পারে না তা তুই জানিস্ কি? তুই যখন খুব ছোট তখন কি ব্যাপার হয়েছিল জানিস্?"

"কি হয়েছিল, মা?"

"তবে শোন্ সেই থেকেই ত আমার গাছের কাঁঠালে কোন চোরেই আর হাত দিতে সাহস করে না।"

"তোমাকে তাদের এত ভয় কিসের?"

"সে বার গ্রামের রঘু বাগ্দি বেটা মিত্তিরদের বড় কাঁঠালের বাগানটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল, আর কাঁঠাল কলকাতায় চালান দিতে লাগল। রাতের বেলায় হতে লাগল কি—আজ এর বাগানের কাঁঠাল চুরি যেতে লাগল—কাল তার বাগানের কাঁঠাল চুরি যেতে লাগল। এই রকম করে কাঁঠাল চুরি আরম্ভ হয়ে গেল। গ্রামের লোকে শেষে পরামর্শ করল সকলে দল বেঁধে চোর ধরতে যাবে। রঘু বাগ্দিও এসে জানাল তারও দু'শ কাঁঠাল চুরি গিয়েছে। সেইদিন থেকে চোর ধরবার জন্যে সকলে দলে রাত্রে বাগানে বাগানে বেড়াতে লাগল। রঘু বাগ্দিও তাদের সঙ্গে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কাঁঠাল চুরি বন্ধ হল না। তবে অনেক কমে গেল। এমন সময় গ্রামে সোনা বিশ্বাস বলে একটা লোক ছিল, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরল। আমাদের পাড়ায় যে তেঁতুলগাছওয়ালা ভিটেটা পড়ে আছে?

মিত্তিররা যাতে কাঁঠালের চারা বসিয়েছে, ঐখানে তার বাড়ী ছিল।"

"সে গলায় দড়ি দিয়ে মরল কেন?"

"তার যে হাঁফের ব্যারাম ছিল। তার বৈষ্ণবীটা ঐ অবস্থায় তাকে ফেলে, পালিয়ে গেল; হাঁফের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শেষে আত্মহত্যা করে ফেলল।"

"তার পর কি হল?"

"এতে সুবিধে হয়ে গেল বস্তা বাগদির। সোণা গলায় দড়ি দেওয়ার পর থেকে, সোণা বৈষ্ণবের তেঁতুল গাছে প্রত্যহ ভীষণ কোঁথানীর শব্দ শোনা যেতে লাগল। লোকে শঙ্কিত হয়ে পড়ল ও রাত্রিতে বেড়ান বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে অবাধে কাঁঠাল চুরি হতে লাগল। পদা কলু একদিন সোণা বৈষ্ণবের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সে সেই তেঁতুল গাছের উপর বিকটাকার চেহারা দেখে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সে সেই ভীষণাকার চেহারা দেখে ছুটে এসে মিত্তিরদের বৈঠকখানায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। মিত্তিরদের ছোটকর্ত্তা তখন তার মুখে জলটল দিয়ে বাঁচালেন। এই ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যা হলেই সকলে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকতে লাগল। ওদিকে চোরে বেশ মজা পেয়ে গেল। প্রত্যহই বেশ কাঁঠাল চুরি হতে লাগল। আমার বাগান থেকেও দু'শ কাঁঠাল চুরি হয়ে গেল। আমি পাড়ার লোকদের বললাম, তারা বলল কি করব ঠাকরুণ,

দেখ্ছেন ত সকলের অবস্থাই সমান। আমি বল্লাম—তোমরা যদি না দেখ তবে গ্রামের সকল কাঁঠালই ত চুরি হয়ে যাবে। তারা উত্তর করল—মাঠাক্রুণ, বেঁচে যদি থাকি তবে ত কাঁঠাল খাব। যদি ভূতেই ঘাড় মট্‌কে দেয় তবে কাঁঠাল খাবে কে?

আমি মেয়েমানুষ, আমি আর কি করব, চুপ করে বসে থাক্লাম। প্রত্যেক রাত্রিতেই কাঁঠাল চুরি চল্তে লাগ্ল। পরে হঠাৎ একদিন তোমার রাধারমণ দাদা এসে উপস্থিত হল। সে তখন সি-আই-ডিতে প্রথম ঢুকেছে, আমি তাকে সকল কথা বল্লাম। সে বল্ল—"মামী, আমি তোমার কাঁঠাল চোর ধরে দিয়ে তবে যাব।" আমি বল্লাম—"বাবা, শেষে কাঁঠাল চোর ধর্তে গিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়, কাজ নেই আর কাঁঠাল চোর ধরে। যে রকম চুরি হচ্ছে তাতে একজনে কখন এত কাঁঠাল চুরি কর্তে পারে না। তুমি বাবা একা চোর ধর্তে যেও না।" রাধারমণ বল্ল—"মামী, সেজন্য তুমি ভেব না। চোর পঞ্চাশ জন হলেও আমার কাছে তারা আস্তে পার্বে না।" সেই দিন রাত্রিতে রাধারমণ এসে বল্ল—"মামী, এই নাও তোমার দু'শ কাঁঠালের দাম।" এই বলে আমার হাতে ৪০৲ টাকা দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"বাবা, তুমি কি করে এত শীগ্‌গির চোর ধরলে?"

সে উত্তর কর্ল,—"মামী, তোমার এখান থেকে গিয়ে ললিত ও শশীকে সঙ্গে নিলাম। তারপর ওদের দুজনকে মিত্তিরদের

বৈঠকখানায় রেখে আমি নিজে একটু অন্ধকার হয়ে এলেই ঐ সোণা বৈষ্ণবের তেঁতুলগাছে চড়ে বসলাম। খানিকক্ষণ পরে দেখি একজন লোক ঐ তেঁতুলগাছে উঠছে। আমি প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। যেই সে লোকটা নিকটে এল, অমনি তার মাথার চুল চেপে ধরলাম। অমনি সেই লোকটা গোঁ গোঁ শব্দ করে নীচেয় পড়ে গেল। আমি চুল ধরে তাকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। আমি তখনই ভূত ধরেছি বলে ললিত ও শশীকে ডাক দিলাম। বৈঠকখানায় যারা ছিল, সকলেই ছুটে এল। তখন নীচেয় এসে দেখি রত্না বাগদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বেটাকে তখন ধরাধরি করে নিস্তিরদের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে তেল জল অনেক দেওয়া হল, কিন্তু রত্না বেটার কিছুতেই জ্ঞান হল না। তখন সকলেই চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। আমি তার নিশ্বাস ফেলার ভাব দেখে বুঝলাম বেটা নিশ্চয়ই ভিটকিলেমী করে পড়ে আছে। তখন আমি সকলকে বললাম—তোমরা ভেব না, আমার কাছে এমন ঔষধ আছে যে তাতে মরা মানুষেরও জ্ঞান হয়। তখন সকলে বললে তবে শীগগির সেই ঔষধ দেও। তখন আমি বললাম—একখান তক্তা নিয়ে এস, খানিক কাতার দড়ি আর বড় একটা কলসী। সকলে তখনই ঐগুলো নিয়ে এসে হাজির করল। আমি রত্না বাগ্দিকে ঐ তক্তায় তুলতে বললাম। তাকে তক্তার উপর তোলা হলে সকলে বললে এখন ঔষুধ দেও।

আমি বল্লাম—"ওষুধে কি আর মরা মানুষ বাঁচান যায় ? চল। একে তুলে নিয়ে নদীতে নিয়ে যাই, সেখানে গিয়ে এই কলসীটায় মাটী পুরে ওর কোমরে বেঁধে নদীর মধ্যে ফেলে দিই গে। তা না করলে শেষে খুনের দায়ে পড়তে হবে। আমি যেই সকলকে তাকে উঠাতে বল্লাম—তখন রত্না বেটা নড়ে উঠল ও মিটমিট করে তাকাতে লাগল। সকলে বল্ল—রত্নার মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে—আর নিয়ে যেতে হবে না। আমি বল্লাম—মূর্চ্ছা ভাঙলে কি হয়, ওর যে রকম আঘাত লেগেছে ওকি বাঁচে ? চল এই বেলা ফেলে দিয়ে আসা যাক্। আমি চোখ টিপতে সকলেই উঠাতে গেল। তখন রত্না বেটা আমার পাটা চেপে ধরে বল্ল —"হেই দাদাঠাকুর আমাকে মারবেন না, আপনারা আমাকে যা শাস্তি দিতে হয় দিন। তখন আমি বল্লাম—"আগে তুই বল তোর দলে কে কে আছে?" তখন সে সকলেরই নাম করে দিল। মামী, সেই পদা কলুও এই কাঁঠাল চোরের মধ্যে একজন। তখনি সব বেটাকে ধরে এনে যার যত কাঁঠাল চুরি হয়েছিল সব কাঁঠালের দাম আদায় করে আর প্রত্যেককে সাত হাত নাকে খত দিয়ে তবে ছেড়ে দিয়েছি। সব বেটাই অনুগত ও মেজ মামার প্রজা বলে আর জেলে দিলাম না।"

আমি বল্লাম—"ভাল করেছ বাবা, জেলে দিয়ে আর কি হবে, তাদের ছেলেপিলেগুলো না খেয়ে মরবে বইত নয়।"

"সেই থেকে আমার গাছে কখন কাঁঠাল চুরি হয় নি।"

কুমুদ—"দাদা ত খুব সাহসী !"

"তা না হলে কি এত উন্নতি হয়? এখন কবে আমাকে বাড়ী রেখে আসবি তাই বল্?"

"যেদিন তুমি বল সেই দিন রেখে আসব।"

"[illegible] রাঁধুনী বামুন জোগাড় করে নে, তবে ত যাব।"

"বামুন কোথা পাব মা, এ জঙ্গলা দেশে কি বামুন পাওয়া যায়?"

"তবে কি করে যাব, তুই হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে রেঁধে খেতে পারবি কেন?"

"খুব পারব, তোমাকে বাড়ীতে রেখে আসবার সময় কলিকাতা হয়ে একটা কুকার নিয়ে আসব তাহলে আর রেঁধে খেতে কষ্ট হবে না।"

"কেন, রেঁধে খেতে আবার কষ্ট হবে না?"

"তা কেন হবে? তাতে যে ডাল, ভাত, তরকারী এক সঙ্গে এক পাত্রের মধ্যে সব আপনিই রাঁধা হয়ে যায়।"

"আচ্ছা, তবে তাই আনিস্। আমি কিন্তু দেশে গিয়ে তোর জন্যে একটি মেয়ে ঠিক করে আসব।"

"তাহলে ঠিক করে আসবে মা?" কুমুদ কাতর ভাবে এই কথা বলিল ও তাহার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া মহামায়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিবাহের কথা বলিলেই কুমুদের মুখখানি বিমর্ষ হইয়া যায়। কুমুদ কি বৌকে

আন্তরিক ভালবাসে? তার কথাবার্ত্তায় তা কিছু ত বুঝা যায় না। তাহার শাশুড়ী এরূপ অভদ্র ব্যবহার করিল, বৌ এত ধৃষ্টতা দেখাইল ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিল, তথাপি সেই বৌয়ের উপর কোন রাগের লক্ষণ ত দেখিতে পাই না। শুনেছি যাহারা প্রেমান্ধ, তাহারা প্রেমাস্পদের কোন দোষ দেখিতে পায় না। কুমুদ বৌমাকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নয়। কেবল আমার খাতিরেই কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলে না। বৌমা সুন্দরী ও শিক্ষিতা, কুমুদও সুন্দর ও শিক্ষিত। উহাদের যোগ্য মিলনই হইয়াছে; আমি যদি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একটি নিরক্ষরা কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করি তাহাতে আমার হয়ত ঘর সংসারের কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সেই কন্যা কি কুমুদের যোগ্যা হইবে? আমি নিজের সুখের জন্য কুমুদকে চির-দুঃখী করিব? আমি স্বার্থপর ত কম নই। কুমুদকে কষ্ট দিয়া আমি সুখী হইব ইহা আমার কিরূপ ভ্রান্তি? আমি দেখিতেছি, আমি যে কাজ করিতে যাইতেছি তাহাতে শান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। কুমুদের যাহাতে সুখ, আমি তাহাতেই সুখী হইব। কুমুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করি কেন? সে কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু। তাহার কর্ত্তব্য তাহারই হাতে ছাড়িয়া দেওয়া আমার উচিত। বিবাহের কথা বলিলেই বাছার মুখখানি বিমর্ষ হইয়া যায়। বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বাছাকে আমি নিশ্চয়ই কষ্ট দিই।

আমি বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে আর অনুরোধ করিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামায়া কুমুদকে বলিলেন—"আচ্ছা কুমুদ, বৌমা যদি পুনরায় বিয়ে করে তখন ত তুই বিয়ে করতে রাজি আছিস্?"

কুমুদ মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিল—"তা কি সে করে! সে এত হীন চরিত্র হতে পারে না।"

"আচ্ছা তবে আমি কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখি।"

কুমুদের মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—:•:-

নরেশ বাবু কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন—সুরমা বিমর্ষ ভাবে কি চিন্তা করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তাঁহার সংসার বর্ত্তমানে যে নিরানন্দের আগার হইয়াছে, তাহা তিনি বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। সুরমাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য তিনি বলিলেন—"কি মা, তোমার বুড়ো ছেলের আস্‌তে বিলম্ব হয়েছে বলে ভাব্‌ছ ?"

স্নেহময় পিতার আহ্বানে সুরমার চমক ভাঙ্গিল ও বলিল—"সত্যি বাবা, আজ আপনার বড়ই বিলম্ব হয়েছে।"

"হ্যাঁ মা, আজ একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। একটা Judgment লিখ্‌ছিলাম—সেইটে শেষ করতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। এখন শীগ্‌গির করে চায়ের ব্যবস্থা কর দেখি।" সুরমা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

নরেশ বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাঁহার এই আনন্দময় সংসারটী দিন দিন নিরানন্দের আগার হইয়া পড়িতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে? মাধবী না তিনি স্বয়ং? সারাদিন

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় চায়ের টেবিলে বসিয়া কিরূপ অপার আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেন, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী ও তিনি স্বয়ংত থাকিতেনই ইহা ভিন্ন গৃহশিক্ষক কুমুদ ও অপর সমাগত বন্ধুবান্ধব থাকিতেন। সকলেই চায়ের টেবিলে আসিয়া একত্রিত হইতেন। এই সময়ে আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইয়া যাইত। যাহার যাহা অভাব অভিযোগ, এই সময়ে তাঁহার নিকট পেশ হইত এবং সে সকলের তিনি সন্তোষ জনক ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এই সময়ে তিনি অনুভব করিতেন সংসার কিরূপ সুখময়, ইহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিপরীত—সে হাসিও নাই, সে আনন্দও নাই। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই; কেন এমন হইল? মাধবীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়াই কি তিনি এই অসন্তোষের বীজ রোপণ করেন নাই? তাঁহারই বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে যে হলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হারাইয়াই ত আজ হিন্দু জাতিকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। হায়! কেন তিনি মাধবীকে হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা না করাইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন?

পূর্ব্বের ন্যায় মাধবী, সুরমা ও উপেন চায়ের টেবিলে আসিল; কিন্তু সকলেরই মুখ গম্ভীর। সকলেই নির্ব্বাক হইয়া চা পান করিতে লাগিল। নরেশ বাবু সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাধবী, তুমি বাইবেলখান সম্পূর্ণ পড়েছ কি ?"

মাধবী উত্তর করিলেন—"সম্পূর্ণ ? কতবার পড়েছি তাই জিজ্ঞাসা কর।"

"আচ্ছা, বাইবেলে পৌত্তলিকতার কিছু আভাস পেয়েছ ?"

"পৌত্তলিকতার আভাস কি জন্য পাব ? এ কি আর তোমাদের হিন্দু ধর্ম্ম যে পুতুল পূজার কথা থাকবে ?"

"না—আমি পুতুল পূজার কথা বলছিনে। তবে বাইবেলের প্রথম পাতে—God created man in his own image এই Sentenceটি আছে কি ?"

"হাঁ আছে বটে, কিন্তু তাতে কি ?"

"না কিছু না, তবে এতেই বুঝা যায় খ্রীষ্টের সেবকগণও ঈশ্বরকে মানুষের মত দেহ বিশিষ্ট বলে কল্পনা করে থাকেন।"

"তাতে কি তাঁরা পৌত্তলিক হয়ে পড়লেন ? তুমিও কি পুতুল পূজা করা ঠিক বলে মনে কর ?"

"তা যদি করতাম তা হলে এতদিন তুমি বুঝতে পারতে না ?"

"তুমি যে পাকা লোক, তোমার ভিতরের মানুষটিকে চেনা বড় সহজ ব্যাপার নয়, তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। আর তোমার এই গৌরচন্দ্রিকার অর্থ যে কিছুই অনুভব করতে পারছিনে তাও বড় নয়।"

"কি বুঝ্‌লে?"

"তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বুঝাতে চাও যে হিন্দুদের পুতুল পূজা করাই ঠিক। কিন্তু আমি তা কিছুতেই স্বীকার কর্‌ব না, তা তুমি জেনে রাখ।"

"আমি শাস্ত্রের আর কি জানি যে তোমাকে বুঝাতে যাব। তবে আমার বিশ্বাস কোন ধর্ম্মকেই নিন্দা করার কিছুই নেই।"

"তোমার হিন্দু ধর্ম্মে সুখ্যাতি করার কি আছে? গোপীগণের বস্ত্রহরণ?"

"যে প্রকৃত ভক্ত সেই তা বল্‌তে পারে। আমি অনধিকারী, আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না।"

"এমন বীভৎস ব্যাপারেরও আবার কেও সমর্থন কর্‌তে পারে?"

"তুমি বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" খানি একবার পড়ে দেখ, তা হলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান হবে। ঐ বইখানি আমার এই আল্‌মারীতে আছে। আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। বৈষ্ণবগণ গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় বলে ধরে নেন, ইন্দ্রিয়কে যিনি পালন করেন তিনি গোপ। পরমাত্মা যে শক্তি আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি লীলা প্রকাশিত করেন তাহাই গোপী। অতএব গোপী বল্‌লেই গোয়ালার স্ত্রী মনে করা ঠিক নয়।"

"কৃষ্ণ-চরিত্রে,—"বঙ্কিম বাবু এমন কি দেখিয়েছেন—যাতে আমার জ্ঞান হবে?"

"ঐ পুস্তকখানি আগে পড়—তারপর ও সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তর্ক কর। তুমি বোধ হয় মনে কর হিন্দুধর্ম্মে পুতুল পূজার কথাই বলেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর তোমার এত শ্রদ্ধা, এও সেই হিন্দুদের বেদান্তের মত নিয়েই হয়েছে। বেদান্তে এক ব্রহ্ম বই আর কিছুই মানে না।"

"হিন্দুদের মতে যদি এক ব্রহ্ম বই আর কিছুই নেই তবে এই পুতুল পূজার সৃষ্টি হল কি করে?"

"বেদান্তের ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাই তোমাকে প্রথমে বুঝাতে হবে। বেদান্তের ব্রহ্ম হচ্ছেন অখণ্ড পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ—সৎ নিত্য, চিৎ-জ্ঞান আনন্দ সুখ, অবাঙ্মনস-গোচরম অর্থাৎ বাক্ ও মনের অগোচর। যে যে ধর্ম্ম একেশ্বরবাদী, সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীরা ঈশ্বরকে বেদান্তের ঈশ্বরের মতই মনে করেন অথচ তাঁদের মধ্যে চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যান করছেন তাও দেখি, তখন বাস্তবিকই আমার হাসি পায়। তাই হিন্দুরা একটা রূপ কল্পনা করে থাকেন। খ্রীষ্টের ভক্তগণ যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি মানুষের ন্যায় বলে পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন তা তোমাকে দেখিয়েছি। মহম্মদের শিষ্যগণও যে তা করেন না তা নয়। ঈশ্বরের যদি মূর্ত্তি কল্পনা না করা যায় তা হলে ফয়সালা হাকমে রোজ কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর রত্ন-সিংহাসনে বসে কি করে জীবাত্মার বিচার করেন ও তাদের সওয়াল জবাব শোনেন?"

"রূপ একটা কল্পনা করার উদ্দেশ্য কি?"

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।

উপাসকানাম্ কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

বেদান্তের সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্মকে ত ধ্যান করা যায় না সেজন্য ভগবানের একটা মূর্ত্তি উপাসকগণ তাঁদের সুবিধার জন্য কল্পনা করে নিয়ে থাকেন। যে মূর্ত্তি যাঁর ভাল লাগে তিনি সেই মূর্ত্তিতে ভগবানের আরাধনা করে থাকেন ও সেই মূর্ত্তিই তাঁর ইষ্ট দেবতা।"

"যা ইচ্ছা তাই ভাবলেই বুঝি ঈশ্বরকে ভাবা হ'ল?"

"হাঁ, ঈশ্বরের ত কোন মূর্ত্তি আমরা জানি নে, কেও যদি ঈশ্বরকে দুর্গা মূর্ত্তিতে পূজা করেন তাতে ক্ষতি কি?"

"দুর্গা হলেন মেয়ে মানুষ, শিবের স্ত্রী, তিনি ঈশ্বর কি করে হলেন?"

"ঈশ্বর মেয়ে কি পুরুষ তা কি কেও বলতে পারে? তাই যাঁরা মা বলে ডেকে তৃপ্ত পান তাঁরা ঈশ্বরকে মা বলেই ডাকতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় আছে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—অর্থাৎ যে আমাকে যে ভাবেই ভজনা করুক না কেন, আমি সেইভাবেই তার পূজা গ্রহণ করব। অতএব ক্রিষ্টিয়ান যদি God বলে পূজা করে, মুসলমান যদি আল্লাহ্ বলে, হিন্দু শাক্ত যদি মা দুর্গা বলে, আর হিন্দু বৈষ্ণব যদি শ্রীকৃষ্ণ বলে পূজা করে তবে তিনি প্রত্যেকেরই পূজা গ্রহণ করবেন না কেন?"

"তুমি আমার আসল প্রশ্নের উত্তর দিলে কৈ? দুর্গা শিবের স্ত্রী—তিনি ঈশ্বর কি করে হলেন?"

"এখানে দুর্গাকে ঈশ্বর বলা চলে না। ঈশ্বর হলেন সকলের অপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন এটা ত তুমি স্বীকার কর?"

"তা আর কে না করে?"

"ঈশ্বরের সেই মহাশক্তির উপাসনা করাকেই শক্তি পূজা করা বলে। ভক্তেরা সেই মহাশক্তিরই আরাধনা করে থাকেন। সেই শক্তিরই নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কাহারও শক্তি খাটে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হলেন সগুণ আর মহাশক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন নির্গুণ। দুর্গার জন্ম যদি স্বীকার করতে হয় তবে তাঁতে আর ঈশ্বরত্ব থাকে না। ভক্তগণ কিন্তু তাঁর জন্ম স্বীকার করেন না। তিনি অনাদি ও অনন্ত।"

"তবে শিবের দুর্গাকে তুমি কি বলে মনে কর?"

"তিনি শিবানী, সেই মহাশক্তিরই অংশ মাত্র।"

"এই দুর্গাই ত মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন?"

"না—এই দুর্গা যে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তা আমি স্বীকার করতে পারি নে।"

"বাঃ! তুমি যে একটা নূতন কথা বলছ, তবে এ দুর্গা এলেন কোথা হতে?

"ভগবতী চণ্ডিকা কখন কাহারও স্ত্রী বলে পরিচয় দেন নি। শুম্ভ বধের পূর্ব্বে যখন শুম্ভের দূত তাঁকে শুম্ভের পত্নীভাবে শুম্ভের

নিকট লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে
স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

তিনি যদি শিবের পত্নী হতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন যে তিনি শিবের বিবাহিতা অতএব অন্যপতি স্বীকার করতে পারেন না।"

"তুমি যেরূপ বলছ তাতে ত দুজন দুর্গা হয়ে পড়ে?"

"দুজন কিছুই নয়। যে দুর্গার আরাধনা করা হয় তিনি নিত্যা, তবে জগতের হিতের জন্য উৎপন্না বলে অভিহিতা হন। শিবানী ঐ মহাশক্তি হতে অভিন্ন বলেচেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে ঐ মহাশক্তি হতে শিবানী, ব্রহ্মাণী, নারায়ণী প্রভৃতি আবির্ভূতা হয়েছিলেন। ঐ সকলই তাঁহার বিভূতি মাত্র।"

"পুরাণের কথা আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

"প্রবৃত্তি না হয় বিশ্বাস করে কাজ নেই। তবে প্রত্যেক ধর্ম্মেই যে একই উদ্দেশ্য আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তি আর নিজের অনন্ত সুখ ভোগ, এত তুমি স্বীকার কর?"

"হাঁ তা ত করি।"

"সকল ধর্ম্মেই উপদেশ আছে যে পুণ্যময় জীবন যাপন কর্‌লে স্বর্গে যাওয়া যায় অর্থাৎ সুখী হওয়া যায় ?"

"হা তা ঠিক।"

"এ সকলই অবশ্য অনুমানের কথা। কারণ স্বর্গ যে কেও দেখেছে তাত কেও বল্‌তে পারে না—বা মৃত্যুর পর জীবের কি ঘটে তাও কেও জানে না। হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়া সকল ধর্ম্মেই স্বর্গলাভই প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে জীবের চরম উদ্দেশ্য হচ্চে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হওয়া।"

"অভিন্ন অর্থত বুঝ্‌লাম না।"

"অভিন্ন অর্থ এক।"

"জীব যদি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হবে তবে সকল জীবই ঈশ্বর হয়ে পড়্‌বে, তাতে অসংখ্য ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়ে পড়্‌বে।"

"না, তা হবে না। জীবের ঐরূপ অবস্থা হয়ে পড়্‌লে, তার আর অস্তিত্বই থাক্‌বে না, সে ভগবানের সঙ্গে মিশে যাবে। একেই হিন্দুরা মুক্তি ও বৌদ্ধরা নির্ব্বাণ বলে থাকেন. এর পর আর জন্ম হবে না! এই জীবের চরম উন্নতি।"

"তাতে জীবের লাভ কি ?"

"লাভ আছে বই কি? এর পর আর জীবকে পুনর্জন্মযন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে না। ঈশ্বর চিরানন্দময়, কাজেই যে তাঁর সঙ্গে মিশে যাবে, সে অনন্ত কালের জন্য আনন্দ উপভোগ কর্‌বে।"

'স্বর্গে গেলেও ত আনন্দ উপভোগ করা যায়।"

"সে আনন্দে আর এ আনন্দে অনেক প্রভেদ। পুণ্যক্ষয় হলে স্বর্গ হতে বিচ্যুত হয়—কিন্তু মুক্তি হলে আর পতনের ভয় থাকে না।"

"আচ্ছা জন্মান্তর যদি আমি বিশ্বাস না করি?"

"জন্মান্তর যদি স্বীকার না কর, তবে আমাকে বুঝাও দেখি, কেও জন্মান্ধ হয়ে জন্মাল, কেও খঞ্জ হয়ে জন্মাল, কেও চিররোগী হয়ে জন্মাল আর কেও বা সুস্থ সবল হয়ে জন্মাল এর কারণ কি? আরও দেখা যায় কেও রাজপুত্র হল এবং কেও বা দরিদ্রের ঘরে জন্মাল। এই সকল পার্থক্য হয় কেন?"

"এ প্রশ্নের আর কি সদুত্তর হতে পারে? মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরের আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কুম্ভকার যে মাটির বাসন প্রস্তুত করে সে কি কোন ব্যবহারের মতলব মনে করে? সেই বাসনগুলির মধ্যে কোনটাতে সুখাদ্য ও সুপেয় বস্তু রাখা হয় আর কোনটাতে বা মল মূত্রও রাখা হয়ে থাকে।"

"মানুষের সঙ্গে বাসনের তুলনা করলে ত চলবে না? তবে হিন্দুরা এর যুক্তি দেন তা তুমি শোন এবং বিবেচনা করে দেখ—তা তোমার যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় কি না?"

"আচ্ছা হিন্দুরা কি যুক্তি দেন তাই শুনি?"

"হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে এই পার্থক্য আপন আপন

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলেই হয়ে থাকে। যে ভাল কাজ করে সে সুস্থ সুবল হয়, ধনীর পুত্র হয়ে জন্মায়। আর যে মন্দ কাজ করে সে অঙ্গহীন ও রোগী হয়ে থাকে এবং দরিদ্রের কুটিরে জন্মগ্রহণ করে। কেও হয় ত পুণ্য সঞ্চয়ও করেছে এবং পাপও করেছে। সেরূপ ক্ষেত্রে সে হয়ত ধনীর পুত্র হয়ে জন্মাল কিন্তু অঙ্গহীন হল। অথবা প্রথমজীবনে সুখ ভোগ করে শেষ জীবনে সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে অশেষ কষ্ট পেল। কেওবা দরিদ্রের কুটিরে জন্মাল কিন্তু অবস্থা ফিরে গিয়ে সুখী হল। ঈশ্বরের কাছে সকলেই ত সমান তখন তিনি—একজনকে সুখী আর একজনকে দুঃখী বিনা কারণে করেন নি সুনিশ্চিত।"

"আচ্ছা ধরে নিলাম পাপ পুণ্যের জন্যই এইরূপ অবস্থা ভেদ হয়ে থাকে কিন্তু বারংবার জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দুগণ কি বলে থাকেন ?"

"কারণ এই যে জীব শরীরে যে আত্মা বাস করেন তিনি জীবাত্মা বলে অভিহিত হন। আর ঈশ্বর স্বয়ং হচ্ছেন পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ মাত্র কাজেই অভিন্ন। কিন্তু জীবাত্মা অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন পরমাত্মা নিত্যশুদ্ধ। যেমন মহাসমুদ্রে প্রবল বায়ু-সঞ্চালিত হলে যেমন অসংখ্য বুদবুদের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ঐ বুদবুদগুলি জল হতে অভিন্ন, কেবলমাত্র ঐ জলে বায়ু অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় ওকে জল হতে পৃথক বলে মনে হয়। তেমনই জীবাত্মাও অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় পরমাত্মা

হতে পৃথক মনে হচ্ছে। জীবাত্মা যদি সাধনা দ্বারা ঐ অবিদ্যাকে নষ্ট করতে পারে তবে সেই জীবাত্মাও পরমাত্মার ন্যায় নিত্য শুদ্ধ হতে পারে। পণ্ডিত পিতার পুত্র যেমন অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারলে পিতার সমকক্ষ হতে পারে, সেইরূপ জীবাত্মাও তপস্যার দ্বারা ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে। জীবের এরূপ অবস্থা হলে সে বুঝতে পারে ঈশ্বর ও তাহাতে কোন প্রভেদ নেই। এই জ্ঞান হল সোহং জ্ঞান—আমিই তিনি অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর বলে বুঝতে পারে। এই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান হলেই ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়। একেই মুক্তি বলে। বালককে মহাপণ্ডিত হতে হলে যেমন অধ্যয়ন করতে হয় ও এক একটি শ্রেণীর পাঠ শেষ হলে পরীক্ষা দিয়া উচ্চশ্রেণীর যোগ্য হলে প্রমোশন দেওয়া, এবং ক্রমে ক্রমে বালক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠতে পারে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে অনেক-গুলি জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। মানুষের এক একটি জন্ম এক একটি শ্রেণী ধরা যেতে পারে। বালককে যেমন অধ্যয়ন করতে হয় জীবকে তেমনই তপশ্চরণ করতে হয়। এক একটি পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহ যদি পাঠে অবহেলা করে তবে সে ফেল হয় ও পুনরায় আর এক বৎসর তাকে সেই শ্রেণীতেই অবস্থান করতে হয়। সেইরূপ কোন জন্মে কেও যদি সাধনায় অমনোযোগী হয় তবে তাকেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সাধনা করতে হয়। সাধনার ক্রটি না হলে তাকে ক্রমে ক্রমে মুক্তির উচ্চ হতে উচ্চতর

ধাপে উঠিয়ে দেওয়া হয় শেষে সে তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি লাভ করে।"

"বাঃ! হিন্দুর idea আমার বড়ই সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।"

"দেখ মাধবী, তুমি হিন্দুদের উপনিষদটা পড়ে দেখ, তা হলে তুমি এ বিষয় ভালরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।"

"বেশ, তুমি একজন দার্শনিক পণ্ডিতকে নিযুক্ত কর। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে কি আছে আমাকে একবার ভাল করে দেখতে হবে। কিন্তু হিন্দুদের পুতুল পূজার কথা মনে হলে, হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি আমার মোটেই শ্রদ্ধা আসে না।"

"আবার নূতন কথা কি বলছ, হিন্দুরা ত পুতুল পূজা করেন না। অসীম ঈশ্বরকে চিন্তা করা যায় না তাই হিন্দুরা তাঁর একটা রূপ কল্পনা করে নিয়ে তারই পূজা করে থাকে। কোন জড় পদার্থের পূজা তারা করে না। কেবলমাত্র মূর্ত্তিই যদি তাদের উপাস্য হত তবে হিন্দুরা পূজার পূর্ব্বে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তার আবশ্যক হত না। পূজার পর বিসর্জ্জন করা হয়, তা তুমি জান। কিন্তু বিসর্জ্জন অর্থে জলে ফেলে দেওয়া নয়। ঐ বিসর্জ্জন মন্ত্রের দ্বারাই হয়ে থাকে। বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ শেষ হয়ে গেলে, তখন ঐ মূর্ত্তিতে আর দেবত্ব থাকে না। তুমি বোধ হয় জান— তখন একজন নিকৃষ্ট জাতি ঐ প্রতিমা স্পর্শ করলে আর কোন দোষ হয় না।"

"হাঁ তা দেখেছি বটে, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—হিন্দুরা নানা দেবতার পূজা করে কেন?"

"পূজা করায় বাধা কি? পূজা করলেই কি তাঁরা ঈশ্বর হলেন? যাঁরা অদ্বৈতবাদী তাঁরা কি শক্তিমান ব্যক্তিকে সম্মান করেন না? পূজা করা অর্থে সম্মান করা। যদি বল ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা থাকিবে কেন? তার উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করি—ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মে Holy ghost এল কি করে? মুসলমান ধর্ম্মেই বা গ্যাব্রিয়েল এল কি করে? তবে হিন্দুদের যত দেব দেবী দেখ্তে পাও তাঁরা সকলেই ভগবানের বিভূতি বই আর কিছুই নন।"

"বিভূতি কথার অর্থ কি?"

"বিভূতি অর্থে বিশেষ রূপ। মনে কর বায়ু যেমন পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আমরা তার মধ্যে ডুবে আছি অথচ আমরা তা অনুভবই করতে পারিনে এবং দারুণ গ্রীষ্মে আমরা কষ্ট বোধ করি, কিন্তু যখন ঐ বায়ুর কোন অংশ প্রকৃতি দ্বারা অর্থাৎ আপনি, অথবা কোন কৃত্রিম- উপায়ে অর্থাৎ পাখার দ্বারা সঞ্চালিত হয় তখন আমরা ঐ বাতাসের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। নিষ্ক্রিয় ভগবানকেও আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনে কেবল মাত্র তাঁর বিভুতি অর্থাৎ ক্রিয়াশীল ক্ষুদ্র অংশকেই আমরা উপলব্ধি করে থাকি। ঐ ক্রিয়াশীল অর্থাৎ সঞ্চালিত বায়ুটুকু ঐ বৃহৎ বায়ু মণ্ডল হতে যেমন পৃথক নয়, তেমনই সগুণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ-কেও নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলে জানবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—০:০—

কুমুদ একটা পাহাড়ের উপর একশত বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়াছিল। ঐ জমিতে একটি পলাশের জঙ্গল ছিল। ঐ পলাশের জঙ্গলের চারিধারে যে ফাঁকা জমি ছিল, সেই সকল স্থানে কুল ও কুসুমের চারা রোপণ করিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে ফাল্গুন মাস। আগামী বর্ষে যে সকল গাছে লাক্ষার বীজ লাগাইতে হইবে সেই সকল গাছের ডাল ছাটাইয়া দিতেছিল। এই সময়ে কুমুদ দেখিল একটি সুন্দর-কান্তি গৈরিক বস্ত্র পরিহিত বালক তাহার বাগানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। সে সময়ে এনার্কিষ্টদের দ্বিতীয় দলের সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়ায় কলিকাতায় খুব ধর-পাকড় চলিতেছিল। কুমুদ মনে করিল—এই বালকটি নিশ্চয়ই ঐ এনার্কিষ্টদলের অন্যতম হইবে। সম্ভবতঃ কলিকাতায় ধরপাকড় হওয়ায় এই প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছে। এইভাবে যদি বেড়ায় তবে পুলিশ নিশ্চয়ই উহাকে কোনদিন গ্রেপ্তার করিয়া বসিবে। কুমুদ যদিও কখন কোন এনার্কিষ্ট দলের সহিত সংশ্রব করে নাই কিন্তু ঐ দলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। কুমুদ ঐ বালকের

নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে, ও কি জন্যই বা সন্ন্যাসীর বেশ ধরে বেড়াচ্ছ ?"

"আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি।"

"এত অল্প বয়সে সংসারে তোমার বৈরাগ্য হওয়ার কারণ কি ?"

"দেখ আমি তোমাকে এনার্কিষ্ট দলের লোক বলে সন্দেহ করছি, এখন যদি তোমাকে পুলিশের হাতে দিই তুমি কি কর ?"

এই কথা শুনিয়া যুবক বিচলিত হইয়া উঠিল ও তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তখন কুমুদ বলিল—"তুমি ভীত হয়ো না। তোমরা দেশের মঙ্গলের জন্য এত কষ্ট সহ্য করছ আর আমি তোমাকে ধরিয়ে দিব, এত হীন আমি নই। তবে আমি উপদেশ দিতেছি এরূপ ভাবে আর বেড়িও না। আজকাল তোমাদের মত বালক সন্ন্যাসীর প্রতি পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। আমার নিকট কোন সাহায্য যদি আবশ্যক মনে কর তবে আমাকে বল।"

"আজ কোথাও আশ্রয় নেওয়ার আমার আবশ্যক হয়েছে। যদি রাত্রিটার জন্য আশ্রয় দেন তবে আমার বিশেষ উপকার করা হয়।"

"বেশ আমার বাড়ীতে থাকতে পার। তোমার আজ আহার হয়েছে ?"

"না, দুই দিন আমি বিশেষ কিছুই আহার করি নি।"

"তবে চল তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া কুমুদ ঐ বালককে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল ও তাহার মাকে ডাকিয়া বলিল—"মা, এই বনবাসের আশ্রমে একটি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি এসে জুটেছে, একে শীঘ্র কিছু খেতে দেও।"

মহামায়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন গৈরিক বস্ত্র পরিহিত একটি কিশোর সন্ন্যাসী। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার স্নেহের উদয় হইল। তিনি বলিলেন—"বাবা তুমি এই কচি বয়সে এ বেশ ধরেছ কেন?"

বালক উত্তর দিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মহামায়াকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় দিল।

মহামায়া বলিলেন—"বাবা, তোমাকে দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্ছে, তোমার কি মা নেই? তুমি বালক, তোমার এ বেশ ত ভাল দেখাচ্ছে না?"

বালক উত্তর করিল, "মা, মানব মাত্রেরই সাধনায় অধিকার আছে। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ কি বালক ছিলেন না?"

"হাঁ বালক ছিলেন বটে, কিন্তু ধ্রুব বা প্রহ্লাদ আর কয়জন হতে পেরেছে? কিন্তু যখন যার সময় তখন তাই কর্‌তে হয়। এখন তোমার পড়াশুনা করা উচিত। এখন যদি এ রকম করে ঘুরে বেড়াও তবে লেখা পড়া শিখ্‌বে কবে? লেখা পড়া না শিখ্‌লে ত মানুষ হতে পার্‌বে না?"

কুমুদ বলিল—"মা, এখন ঐ সকল কথা থাক্। এ দু তিন দিন কিছু খায়নি, যদি হাঁড়িতে ভাত থাকে তবে শীগ্গির একে খেতে দেও।"

"বলিস কি, দুই দিন কিছু খায় নি? এস বাবা, তোমাকে ভাত দিই গে।"

এই বলিয়া মহামায়া বালককে সঙ্গে লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। বালকের আহার শেষ হইলে বাহিরে আসিয়া মহামায়া বলিলেন—"কুমুদ, বিনয়কে আমরা আমাদের কাছে রাখ্ব, এ আমার কাছে থাক্তে স্বীকার হয়েছে। তোরও ত ভাই নেই এ আজ থেকে তোর ছোট ভাইয়ের অভাব দূর করবে।"

"বেশ ত, এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে তোমার আর একটি ছেলে এসে জুটল এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি আছে?"

কুমুদ তাহার বাগানে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিনয় কুমুদের বাড়ীতেই রহিয়া গেল। সে কয়দিন মাত্র আসিয়াছে ইহারই মধ্যে সাংসারিক সকল বিষয়ের ভারই তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে বা সে নিজেই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়াছে। সে প্রত্যূষে উঠিয়া মহামায়ার পূজার সমস্তই জোগাড় করিয়া দেয়, ও মহামায়ার অন্যান্য কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

কুমুদ মনে মনে ভাবিল—তাহার গালার কারখানার জন্য একজন কেরাণীর প্রয়োজন হইবে। যদিও এখন সেরূপ কাজের ভিড় হয় নাই কিন্তু আগামী বৈশাখ হইতে আবশ্যক হইবে। যদি বিনয় থাকে তবে উহাকেই রাখিয়া দিব। তবে ও যদি এনার্কিষ্ট দলের লোক হয়—তবে নিশ্চয়ই থাকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুমুদ বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"বিনয় তুমি আমাদের কাছে থাক্‌বে ত?"

বিনয় উত্তর করিল—"থাক্‌বই ত বলেছি।"

"তা হলে গালার কারখানায় গিয়ে কাজ শিখ্‌তে আরম্ভ করে দেও।"

"গালার কারখানার কাজ কি আর আমি পারব? ও সকল কাজের আমি জানি কি?"

"কাজ কি আর মানুষ পেটে থেকে পড়েই জানে? কাজ শিখ্‌তে হয়।"

"আমি ত মার সঙ্গে সর্ব্বদা কাজ করি। গালার কাজ আর কখন করব?"

"তোমাকে আর বাড়ীর কাজ করতে হবে না, ও ত মেয়ে মানুষের কাজ।"

"আপনি আমাকে যে পুলিশের ভয় দেখিয়েছেন, সেই থেকে আমার আর বাড়ীর বাইরে যেতে সাহস হয় না।"

"আল্‌খাল্লাটা খুলে ভদ্রলোকের মত বের হলে আর পুলিস কিছু বল্‌বে না।"

মহামায়া বলিলেন—"তুই এত ভয় করছিস কেন বিনয়? তুই সাধারণ পোষাকে বের হলে কুমুদ যদি ভাই বলে পরিচয় দেয় তবে কি আর পুলিশে করবে? তোর আল্‌খাল্লাটা খুলে ফেল।"

"গালার কাজ শিখে আর কি করব, কোন দিন কারবারে ফেল মেরে যেতে যদি হয়, তার চেয়ে চাকুরী একটা দেখে নেব।"

"আমার কাছে থেকে আবার চাকরি?"

"আজকাল চাকুরিই ত' বাঙ্গালীর জীবিকা "

"তুমি যদি প্রকৃত স্বাধীনতা-কামী হও, তবে যে নামের সঙ্গ

অপমান মিশান রয়েছে সেই গোলামী তুমি করতে যাবে? তুমি আমার কাছে থাক, তোমাকেও একটা বাগান আমি করে দেব। তুমিও লাক্ষার চাষ করতে পারবে।"

"লাক্ষার চাষ করলে চলবে? ভদ্রলোকে চাষ করে কে কবে সুবিধা করতে পেরেছে?"

"ওঃ তোমার বুঝি সেই বিশ্বাস, তাই তুমি বাগানের কাজে লাগতে চাচ্ছ না। তুমি জানো না বিনয়, লাক্ষার চাষে প্রচুর লাভ হতে পারে। গত বৎসর ত আমি প্রথম চাষ করেছি, এই প্রথম বর্ষেই আমার খরচ খরচা বাদে ৬০০০৲ টাকা লাভ হয়েছে।"

বিনয়—"বলেন কি লাক্ষার চাষে এত লাভ হয়?"

কুমুদ—"না হলে কি আমি তোমাকে মিথ্যে বলছি বিনয় তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

বিনয়—"আজ্ঞে আমি ইন্টার মিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়েছি?"

কুমুদ—"আচ্ছা আজ কাল চাকরীর বাজার কিরূপ হয়েছে দেখ দেখি? তুমি যদি চাকরী করতে চাও তবে তুমি খুব জোর ২০।২৫ টাকার বেশী মাইনে পাবে কি?"

বিনয়—"না, তার বেশী পাওয়া সম্ভব নয়।"

"আমাদের দেশের যুবকেরা কুড়ি পঁচিশ টাকার চাকরীর জন্ম লালায়িত হয়ে বেড়ায় কিন্তু তারা যদি লাক্ষার চাষ করে তবে তাদের আর গোলামীর জন্ত অন্তের দ্বারস্থ হতে হয় না। বাঙ্গালার সকল স্থানেই ত বহু সংখ্যক কুলগাছ আপনিই জন্মায়, আমাদের

দেশের যুবকগণ অনায়াসেই ঐ সকল কুলগাছে লাক্ষার চাষ করতে পারে।”

“দুই একটা কুল গাছে লাক্ষার চাষ করে এমন কি লাভ হবে?”

“বেশ লাভ হতে পারে। কুল গাছ খুব বড় ও বহু শাখাবিশিষ্ট হলে ঐরূপ একটী গাছেই দেড়মণ কি দুই মণ লাক্ষা হতে দেখা যায়। আর প্রতি মণ ৫০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ দরে বিক্রয় হয়ে থাকে। সুতরাং একটি পুর্ণ বয়স্ক কুলগাছেই ভালরূপ লাক্ষা জন্মিলে, খুব কম করে ধরলেও শতাধিক টাকা পাওয়া যায়। বড় বড় দশটি কুলের গাছে লাক্ষার চাষ করলে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করা যায়। একটি কুলের গাছের আয় হতেই তাহা অনুমান করা যেতে পারে।”

“লাক্ষা কি কেবল কুল গাছেই হয়?”

“না—কেবল কুলগাছে কেন? কুসুম ও পলাশ গাছেও প্রচুর লাক্ষা জন্মে। অন্যান্য গাছে যে মোটেই হয় না তাও নয়। অশ্বথ ও শাল প্রভৃতি গাছেও হয়ে থাকে। অরহরের গাছেও লাক্ষা জন্মান যায়।”

“কোন গাছে ভাল লাক্ষা হয়?”

“কুসুম গাছে যে লাক্ষা জন্মে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মূল্যবান।”

“লাক্ষার এমন কি কাজ হয় যে উহার এত মূল্য?”

"লাক্ষা হইতেই গালা প্রস্তুত হয়। যে সকল জিনিস বড় বেশী কাজে লাগে তাহার মূল্যও তত অধিক হয়ে থাকে। আজ কাল গালার চাহিদা খুব বেশী হয়ে পড়েছে কাজেই মূল্যও বেশী হয়ে পড়েছে।"

"কি কি কাজে গালা ব্যবহৃত হয়?"

"অতি প্রাচীন কাল হতেই ভারতবর্ষে লাক্ষা জন্মাচ্ছে আর সেই সময় থেকেই লাক্ষাজাত গালার ও আলতার ব্যবহার হয়ে আসছে। এদেশের স্বর্ণকারগণ গহনা প্রস্তুত করতে, কংস বণিকগণ কোঁদাই করতে আর শিল্পিগণ গহনা, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে স্মরণাতীত কাল হতে গালার ব্যবহার করে আসছে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশেই এর প্রধান চাহিদা। সভ্য জগতে গালার ব্যবহার দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে ও শীল-মোহরের কার্য্যে, বার্ণিশ প্রস্তুত করতে, গ্রামোফোনের রেকর্ড ও গোলা নির্ম্মাণ কার্য্যে, জাহাজের ডেক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ প্রস্তুত করতে এবং অন্যান্য শিল্প কার্য্যে ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ব্যবহার হচ্ছে। ফলে গালার চাহিদা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা, অন্য দেশে কি গালা জন্মে না?"

"জন্মে না একথা বলা যায় না—তবে পৃথিবীতে যে পরিমাণ গালা ব্যবহৃত হয়, তাহার শতকরা ৯৭ ভাগ একমাত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয়। আসাম, বাঙ্গালা ও মধ্যপ্রদেশেই গালা অধিক

পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর গড়ে আটকোটী টাকার গালা একমাত্র কলিকাতা বন্দর হতেই বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। তদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ ও কারাচি বন্দর হতেও বহু কোটি টাকার গালা রপ্তানি হচ্ছে।”

“লাক্ষার চাষ কি প্রকারে কর্‌তে হয়?”

“লাক্ষার চাষ করা কিছুই শক্ত নয়। যদি কোন পলাশের জঙ্গল বা কুলের জঙ্গল অথবা কুসুম গাছের জঙ্গল পাওয়া যায় তা হলে, সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে, নতুবা ঐ সকল বৃক্ষের বাগিচা প্রস্তুত করে নিতে হয়।”

“কুসুম গাছ ত সকল স্থানে দেখা যায় না!”

“কিন্তু কুল ও পলাশ গাছ বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থানে জন্মায়। এই দুই জাতীয় বৃক্ষের বাগিচা প্রস্তুত করে নিলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই লাক্ষার চাষ করা চলে। পাঁচ বিঘা জমিতে যদি কুলের গাছ বসান যায় তবে একটি যুবকের বেশ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হতে পারে। ষোল হাত অন্তর কুলের গাছ বসিয়ে দিলে এক বিঘা জমিতে ২৬টি কুলগাছ বসান চলে। ঐ কুলগাছগুলি যদি পাটনাই কুলের গাছ হয় তবে কুল হতেও একটা মন্দ আয় হয় না। যতদিন কুলগাছগুলি বড় না হয় ততদিন ঐ জমিতে তরিতরকারী আবাদ করা চলে ও তাহাতে জমি আবাদ হওয়ায় কুলগাছগুলিও শীঘ্র সতেজ হয়ে বৃদ্ধি পায়। জমি ভালরূপ আবাদ হলে কুলগাছগুলি ছয় বৎসরেই লাক্ষা আবাদের যোগ্য

হয়ে থাকে। কুল গাছের গোড়া সর্ব্বদা ঘাসশূন্য রাখতে হয় ও বৎসরে জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসে গোড়ায় খোঁড় দিয়ে দিতে হয়। যাতে কুলগাছের পাতাগুলি গরুতে না খেয়ে ফেলতে পারে, তজ্জন্য ঐ ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়া আবশ্যক।"

"কুল গাছ প্রস্তুত হলে লাক্ষার চাষ কি ভাবে করতে হয়?"

"যখন কুলগাছের গুড়িগুলির বেড় একহাত পরিমাণ হয় তখন হতে লাক্ষার আবাদ করা চলে। যে বৎসর লাক্ষার আবাদ করতে হবে সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে ডালগুলি সমস্ত কেটে ফেলা আবশ্যক কারণ পুরাতন ডালে লাক্ষা জন্মেনা। আষাঢ় মাসের মধ্যেই কর্ত্তিত-শাখ কুলগাছগুলিতে বহু সংখ্যক নূতন ডাল বাহির হয়। ঐ সময়েই গাছে বীজ লাগাতে হয়। অর্দ্ধহস্ত পরিমিত লাক্ষাযুক্ত—লাক্ষার ডিম সহ—সরু ডাল (ইহাই বীজ নামে অভিহিত) কুলগাছের প্রত্যেক ডালে কলায় ছোটা বা পাটের আঁশ দিয়ে বাঁধিয়া দিতে হয়। আষাঢ় মাসে লাক্ষা হতে পোকা বে'র হয়ে চলতে আরম্ভ করে সুতরাং ঐ সময়ই বীজ লাগাবার বা লাক্ষার বীজ কাঠি কুল গাছের ডালের সহিত বেঁধে দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। ঐরূপ কার্ত্তিক মাসেও লাক্ষা পোকা চলতে আরম্ভ করে সুতরাং ঐ সময়েও বীজ লাগান হয়।"

"তবে কি বৎসরে দুইবার লাক্ষার আবাদ করা চলে?"

"হাঁ, বৎসরে দুইবার করে লাক্ষা সংগ্রহ করতে পারা যায়।

অবশ্য একই গাছে দুইবার লাক্ষা করা চলে না ! যে গাছে আষাঢ় মাসে বীজ লাগান যায় তাহা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে পরিপক্ক হয় সেজন্য তাকে কাতকে বা শীতের ফসল বলে। কার্ত্তিক মাসে যে বীজ লাগান যায় তাহা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পরিপক্ক হয় এজন্য উহাকে বৈশাখী বা গ্রীষ্মের ফসল বলে।"

"লাক্ষা পরিপক্ক হলে কি প্রকারে লাক্ষা সংগ্রহ করতে হয় ?"

"আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে অথবা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে লাক্ষাসহ ডালগুলি কাটিয়া আনিয়া সেই সকল ডাল হতে লাক্ষা চেঁচে নিতে হয়। ডিম ফুটে দুই একটা বাচ্ছা বাহির হতে আরম্ভ করলে এই কার্য্য করতে হয়। সংগৃহীত লাক্ষা ছায়াতে শুকিয়ে গুড়া করতে হয়। উহা একেবারে পিষিয়া না ফেলে দানা অবস্থায় রাখা আবশ্যক। ঐ দানাগুলি সর্ষপ অপেক্ষা বড় ও মসুর অপেক্ষা ছোট হওয়া চাই। লাক্ষার গুড়ার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লাল রং থাকে তা খুব ভালরূপে ধুয়ে ফেলতে হয়। এই গুড়া পদার্থ ২৪ ঘণ্টা পরিষ্কৃত জলে ভিজিয়ে খুব রগড়াতে হয়। এইরূপে জল দিয়ে বারম্বার ধুয়ে ফেললে লাক্ষার মধ্যস্থিত লাল রং বার হয়ে যায়। লাক্ষা ধুবার সময় যে লাল রং পাওয়া যায় তাকেই আলতা বলে। রামায়ণ বা অন্যান্য গ্রন্থে অলক্ত বা আলতার উল্লেখ আছে। সেই সময় হতেই আমাদের দেশে লাক্ষাজাত অলক্তের ব্যবহার ছিল। লাক্ষাধৌত জলে তুলা

ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলেই পাত আলতা প্রস্তুত হয়। আজকাল এনিলিন রং আলতার স্থান অধিকার করেছে! লাক্ষাধৌত লাল রং সংগ্রহ করে রাখলে উহা অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। উৎকৃষ্ট গালা প্রস্তুত করতে হলে লাক্ষার গুড়া বারম্বার ভালরূপেই ধৌত করে ফেলতে হয়। বিধৌত জলে যখন আর লাল রং থাকে না অর্থাৎ জল যখন কাঁচ বর্ণের হয় তখন ধৌত কার্য্যটি ঠিকমত হয়েছে বুঝতে হবে। ভালরূপ ধৌত না হলে উহা হতে নিকৃষ্ট গালা প্রস্তুত হয়। পরে ঐ গুড়াগুলি শুকিয়ে নিতে হয়। একেই জতু বা জৌ বলে।"

"গালা ত গুড়া অবস্থায় দেখা যায় না।"

"হাঁ, কি প্রকারে ঐ জতুগুলিকে চাঁচ গালায় পরিণত করিতে হয় তাও বলছি শোন—কাপড়ের সরু সরু ৪ বা ৫ ইঞ্চি ব্যাসের এক একটি ১০।১২ হাত লম্বা থলি প্রস্তুত করে প্রথমতঃ ঐ থলিগুলি জতু দ্বারা পূর্ণ করতঃ তৎপরে কাঠের কয়লার আগুনের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকল জতুপূর্ণ থলীতে উত্তাপ লাগাতে হয়। এরূপ করলে থলির উপরের অংশগুলি গলে জমাট বেঁধে যায়। ঐ জমাট বাঁধা জতু থলি হতে বার করে টুকরা টুকরা করে মাটির পাতনায় মৃদু জ্বালে গলাতে হয়। অধিক উত্তাপ দিলে গালা পুড়ে যাবার সম্ভাবনা। পাতনার নীচের দিকে একটি ছিদ্র রাখতে হয় ও তাতে একটা নল রাখা প্রয়োজন। ঐ নলদ্বারা গলিত গালা পড়তে থাকলে তা কলার খোলার

বিছিয়ে দিতে হয়। উহা জমিয়া গেলেই চাচ গালা প্রস্তুত হল।"

"আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে ত লাক্ষার চাষ হয় না, সেখানে লাক্ষার চাষ করতে হলে বীজ কোথা হতে সংগ্রহ করা যাবে?"

"ছোটনাগপুর বিভাগে, সাঁওতাল পরগণার কতকাংশে, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহের কতকাংশে যথেষ্ট পরিমাণে লাক্ষার চাষ করা হয়। ঐ সকল স্থান হতেই প্রথমে বীজ সংগ্রহ করে আনতে হয়। একবার লাক্ষার চাষ করলে পরে বীজের জন্য আর কথনও ভাবিতে হয় না। কারণ তখন লাক্ষাযুক্ত শাখা হতেই আবশ্যকানুরূপ বীজ সংগ্রহ করা যেতে পারে।"

"পলাশবৃক্ষেও কি কুলগাছের মত লাক্ষার আবাদ করিতে হয়?"

"হাঁ। প্রায় একই রকম বটে তবে বীজ লাগানর একটু পার্থক্য আছে। পলাশ বৃক্ষে বীজ লাগাতে হলে লাক্ষাযুক্ত ছোট ছোট পলাশের ডাল আধ হাত প্রমাণ করে কেটে ও একমুঠ করে আঁটি বেঁধে বড় ডালের গোড়ায় (যেখান হতে দুই তিন কি ততোধিক শাখা বার হয়েছে, সেই সংযোগ স্থল) এক একটি আটি গুঁজে বা আটকে দিতে হয়।"

"আচ্ছা, এই ব্যবসায়ে কিরূপ মূলধন হলে কাজ আরম্ভ করা যায়?"

লাক্ষার চাষ করতে মূলধন অধিক প্রয়োজন হয় না। কুল বা পলাশের গাছ সংগ্রহ বা প্রস্তুত করে নিতে পারলে আমাদের খরচ অতি সামান্য। অন্যান্য চাষে গরু, কৃষাণ, রাখাল আবশ্যক; এতে সে সকল কিছুই আবশ্যক হয় না। একজন চাকর থাকলেই যথেষ্ট হয়। কেবল বীজ লাগাবার সময় ও লাক্ষা সংগ্রহের সময় ঠিকা মজুর জনকতক নিলেই চলে। ৫/ বিঘা বাগানে লাক্ষার চাষ করতে ১০০৲ টাকা খরচ করে লাভ যথেষ্ট পরিমাণে হতে পারে। প্রতি বিঘায় ২৫টি করে গাছ ধরলে ৫/ বিঘায় ১২৫টি গাছ হয়। প্রতি গাছে গড়ে ।০ দশ সের লাক্ষা ধরলেও ৩০।৩১ মণ লাক্ষা হতে পারে ও প্রতিমণ ন্যূনকল্পে ৪০৲ টাকা হিসাবে ধরলেও ১২০০৲ টাকার কম হবে না। গ্রামের মধ্যে যে সকল কুলগাছ থাকে সেই সকল কুলগাছ ভাড়া নিয়ে যদি কেও লাক্ষার চাষ আরম্ভ করে, তবে কার্য্য আরম্ভ করতে বিলম্ব ঘটে না। ক্রমে তাদের ইচ্ছামত গাছ প্রস্তুত করে নিতে পারে।”

“লাক্ষার চাষ এত সহজ ও এত লাভজনক; আমাদের দেশের যুবকগণ এই দিকে দৃষ্টি দেয় না কেন?”

“সকলেরই নজর হচ্ছে গোলামখানার দিকে তা এ সকল বিষয় চিন্তা করবে কি করে? এখন সে কথা যাক, তুমি কি করতে চাও বল দেখি?”

“ভগবান যখন আমাকে আপনার আশ্রয়ে ফেলে দিয়েছেন

তখন আমাকেও ঐ লাক্ষার চাষের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে কয়েক দিন আমাকে চিন্তা করতে দিন।”

“বেশ তোমাকে সাত দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমার প্রকৃত পরিচয় দেবে ও সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করে লাক্ষার চাষে লেগে যাবে, তবে আমি ছাড়্‌ব।”

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

"মা, শ্বশুরের একখান পত্র এসেছে।" কুমুদ, তাহার মাতা মহামায়াকে বলিল।

"তোর শ্বশুর আবার পত্র দিল কি জন্য?"

"একটা নূতন খবর আছে।"

"নূতন খবরটা কি শুনি? মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে না কি?"

"না, বিয়ে হয়নি, সে কোথায় চলে গিয়েছে।"

"একা গেল, না কোন পুরুষের সঙ্গে পালাল? তা ঐ রকম একটা বিভ্রাট হবে, এটা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? এ ত জানাই ছিল। তোর শাশুড়ীর দোষে এই হল। তার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে। যদি পালিয়েই যাবি, তবে আমাকে কাঁদুনী গেয়ে পত্র লেখা কেন?"

"মা, তুমি তার পত্রের কি উত্তর দিয়েছিলে?"

"আমি তাকে লিখে দিয়েছিলাম যে আমি আমার পুত্রবধূকে সতী সাধ্বী দেখ্‌তে চাই যে অন্য পুরুষকে মনে স্থান দেয় এমন বউ নিয়ে ঘর কর্‌ব না। এটা কি আমি অন্যায় বলেছি বাবা?"

"মা, তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে।"

"সে চলে গিয়েছে ভালই হয়েছে, অসতী বউ নিয়ে ঘর করাও যা আর সাপের সঙ্গে খেলা করাও তাই।"

"মা, সে যে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে যাবে এমন মন্দ সে হতে পারে না। তার অন্তঃকরণ খুব উন্নতই ছিল। আমার চাষের কথা শুনে তার যে মাথা বিগ্ড়ে গেল, অনেক বুঝিয়েও তাকে সুস্থ কর্তে পার্লাম না। আমি মনে করেছিলাম লাক্ষার চাষে প্রচুর লাভ দেখাতে পার্লেই সে বুঝ্বে যে লাক্ষার চাষ যে সে চাষ নয়, দু বছর না হয় বাপের বাড়ী থাকুক কিন্তু আমার শাশুড়ীই যত গোল বাধালেন। তিনি যদি হৈ চৈ না বাধাতেন তা হলে আর এমনটি ঘট্ত না। শ্বশুর লিখেছেন সে বোধ হয় গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে।"

"তোর শ্বশুর তা কি করে জান্ল?"

"তিনি লিখেছেন যে তোমার চিঠিখান যেদিন সে পেয়েছিল, সেই দিন সে কেবল কেঁদেছিল। আমার শাশুড়ী তাকে যতবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন ততবারই সে তীব্রভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমার শাশুড়ী তাকে বিরক্ত হয়ে বিয়ের কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শ্বশুরের বিশ্বাস তোমার পত্র পেয়ে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে থাক্বে। কারণ যাওয়ার সময় হাতের চুড়ি ব্যতীত সমস্ত গহনা রেখে, একবস্ত্রে চলে গিয়েছে।

"তোর কি বিশ্বাস ?"

"মা, আমারও তাই বিশ্বাস, তার একটু অহঙ্কার থাকতে পারে কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র মন্দ হতে পারে না।"

"তা আমাকে আগে বলিস্ নি কেন ? তা জান্‌লে কি আমি ও রকম নিষ্ঠুর পত্র লিখ্‌তাম, আমারই দোষে সতীলক্ষ্মী বউটি আমার গেল !" এই বলিয়া মহামায়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"মা, তুমি আর কি করে জান্‌বে যে সে তোমার পত্র পেয়ে আত্মহত্যা করে বসবে ?"

"যা করে ফেলেছি তার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই বাবা ? এখন আমি দেখ্‌ছি আমিই তাকে মেরে ফেল্‌লাম। এ দুঃখ যে আমার মর্‌লেও যাবে না।" এই বলিয়া মহামায়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।"

"মা, এখন কেঁদে কি হবে ? সে আছে কি সত্য সত্যই আত্মহত্যা করেছে তাই ভাল করে জানা দরকার।"

"মরেনি ত গেল কোথা ? তোর শ্বশুর কি আর মিথ্যে করে লিখেছেন ?"

"সে ত কোথাও লুকিয়েও থাক্‌তে পারে ?"

"তবে তুই কলিকাতায় যা—গিয়ে দেখে আয়। যদি তাকে পাওয়া যায় সঙ্গে করে নিয়ে আসিস্।"

"তুমি কি এখানে একা থাক্‌বে ?"

"কেন বিনয় ত রয়েছে, কই বিনয় যে এখানে ছিল কোথা গেল ?"

"সে হঠাৎ এখান থেকে চলে গেল কোথা ? মা, আমার মনে কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

"কি সন্দেহ বাবা ?"

"বিনয় এখন চলে গেল কেন ? বিনয় সুরমা নয় ত ? শ্বশুরের পত্র পেয়ে অবধিই একটু সন্দেহ হচ্ছিল। সে আমাদের কথা বার্ত্তার সময় চলে যাওয়ায় সন্দেহটা যেন দৃঢ় হচ্ছে।

"ও কি করে আমার বৌমা হবে ?"

"দেখ মা, ও ত সুরমা চলে যাবার পর এসেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে সুরমার চেহারার সঙ্গে যেন বিনয়ের চেহারাও সাদৃশ্য আছে। আমাদের কথা বার্ত্তা আরম্ভ হলেই সে পালিয়ে গেলই বা কেন ?"

"যদি তা হয় বাবা, তবে ত বাঁচি। ঈশ্বর এমন কি করবেন যে বিনয় আমার বৌমা হবে। কিন্তু বাবা, আমারও মনে যেন তাই নিচ্ছে। ও এসে পর্য্যন্ত মেয়েলি কাজ নিয়েই থাকে। কিসে আমার কষ্ট না হয় সেই দিকেই তার লক্ষ্য। আমাকে কিছুই করতে দেয় না। আমার পুত্রবধূর মত যত্নই ও করছিল। বিনয় যদি আমার বউমা হয় তবে আমার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না, বাবা। বউমা আমার আগুনের ভিতর দিয়ে এসেছে কি না তাই খাঁটি সোনা হয়ে এসেছে। শীগগির আমার বউমাকে ডেকে আন আমি তাকে বুকে করে আমার বুকটা জুড়াই। বাছা আমার কত কষ্টই পেয়েছে।"

"মা তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আগে পরীক্ষা করে দেখা যাক্ বাস্তবিক সে সুরমা কি না।"

"আচ্ছা আমি ব্যস্ত হব না। তুই পরীক্ষা করে আমাকে খবর দিস্। আমার কিন্তু বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছে। আমি আজ আর উঠ্‌তে পারব না, আর রান্নাঘরেও যেতে পারব না, আমার হাত পা অবশ হয়ে গিয়েছে। তোরা চিড়ে ভিজিয়ে খাস্।"

"মা, তোমাকে কিছুই করতে হবে না, আমার মোটেই ক্ষিধে নেই।"

"এতে আর কার খাবার ইচ্ছে থাকে? তা তুই বিনয়ের পরিচয় জেনে আমাকে খবর দে। আমি ওকে কত জিজ্ঞাসা করেছি ও কিছুতেই পরিচয় দেয়নি।"

"আমিও অনেক চেষ্টা করেছি, আমাকেও কিছু বলে নি।"

কুমুদ ম্লান মুখে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ও বাহিরে কোথাও বিনয়ের অনুসন্ধান করিয়া পাইল না। ঝি বলিল—"বিনয় বাবু স্নান করিতে পুকুরে গেছেন। বিনয় দুই বেলাই স্নান করিত তাহা কুমুদের জানা ছিল। তখন তিনি ধীরে ধীরে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

"ভাত খেতে আসবেন না?"—বিনয় কুমুদকে জিজ্ঞাসা করিল।

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কুমুদের হঠাৎ চিন্তাস্রোত বাধা প্রাপ্ত হইল। তাহার চমক্ ভাঙিয়া গেল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিল—সম্মুখে বিনয় দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাত কে রেঁধেছে? মা যে আজ রাঁধতে পারবেন না বলেছিলেন।"

"হাঁ, মার আজ অসুখ করেছে, তিনি রাঁধতে পারেন নি।"

"তবে ভাত হল কি করে?"

"আজ্ঞে আমিই রেঁধেছি।"

"তুমি ত পরিচয় দেও না, তোমার হাতের রান্না খাই কি করে?"

"আমার হাতে রান্না খেলে দোষ হবে না।"

"তা কি করে জানব? তুমি সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীর কি জাতি আছে?"

"না খান ত কি খাবেন ?"

"আজ ত চিড়ে ভিজিয়ে খাবার কথা ছিল।"

"আপনি খাবেন বলে রাঁধলাম।"

"তা তুমি খাও গে।"

"আমিও আর খাবনা।" বিনয়ের মুখখানি মলিন হইয়া গেল—চক্ষু দুইটি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল।

"আমি খাবনা বলে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে ?"

"না—দুঃখ আর কি ?"

"আচ্ছা আমি খেতে পারি যদি তুমি তোমার পরিচয় দেও।"

"বিনয় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—কোন উত্তর দিল না।"

কুমুদ বলিল—"আচ্ছা তোমার পরিচয় দিতে হবে না—কেবল আলখাল্লাটা খুলে ফেল—তা হলেই তোমার হাতে খাব।"

বিনয় তথাপি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমুদ বলিল—'আজ কিন্তু তোমার আলখাল্লা না খুলিয়ে ছাড়্‌ব না। আমাকে তোমার এত অবিশ্বাস কেন ?"

"আপনাকে আমার কোন অবিশ্বাস নেই।"

"তবে এস তোমার আলখাল্লাটা খুলে দিই।"

এই বলিয়া কুমুদ বিনয়ের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিল। বিনয় সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

"একি বিনয়, তোমার হাতে লোহা কেন ?"

"পাগল হলেও লোহা হাতে দেয়, তাকি আপনি জানেন না ?"

"তুমি পাগল হয়েছিলে না কি ?"

"হয়েছিলাম বৈ আর কি ?"

"এখনত তোমার পাগলামি ভাল হয়ে গিয়েছে। এখন আলখাল্লাটা খুলে ফেল। আজ ত আর কিছুতেই ছাড়্‌ব না তা বোধ হয় বুঝেছ ?"

"আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, আমি নিজেই খুল্‌ছি। এই বলিয়া সে কুমুদের পা দুটি ধরিয়া বলিল—"আমাকে কি আপনারা ক্ষমা করবেন ?" এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না, চখের জলে কুমুদের পা দুইখানি ভাসাইয়া দিল। কুমুদ তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া উঠাইয়া তাহার বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে কুমুদ গিয়া মহামায়াকে ডাকিল—"মা, সুরমা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।"

মহামায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—"কৈ আমার বৌমা কোথা ?"

তখন কুমুদ ও সুরমা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মহামায়া আবেগ ভরে সুরমাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। উভয়েরই নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কাহারও কথা বলিবার শক্তি রহিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নরেশবাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মাধবী শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার উপাধানটি একেবারে সিক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিলেন মাধবী অশ্রুপাত করিয়াই দিনটি অবসান করিয়াছেন। নরেশ বাবুকে দেখিয়া মাধবী তাঁহার মুখখানি বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন। নরেশবাবু তাঁহার মনকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাধবী গীতা তোমার কেমন লাগ্‌ল বল দেখি?" মাধবী উত্তর করিলেন—"লাগ্‌ছে ত ভালই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে নিজেকেও ঈশ্বর বলে পরিচয় দিচ্ছেন, এটা আমার কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।"

"কেন?"

"শ্রীকৃষ্ণ ত একজন মানুষ, তিনি ঈশ্বর হলেন কি করে?"

"আচ্ছা, তাঁকে তুমি মানুষ বলেই ধরে নিতে পার। তবে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে, সে ত নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে কর্‌তে পারে।"

"তা পারে বটে।"

"তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বজ্ঞানী মনে করে নেওনা, তা হলে ত আর কিছুই অসম্ভব বলে মনে হবে না।"

"বাঃ তুমি ত আমাকে এক কথায় বুঝিয়ে দিলে মন্দ নয় দেখ্‌ছি। আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা, আমায় বল দেখি?"

"আমার যা বিশ্বাস তা বল্‌লে হয়ত তুমি আমাকে গোঁড়া বল্‌বে।"

"না, তা আর বল্‌ব না। এখন আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে তুমি যা বল, তা তোমার ভাসা কথা নয়, তুমি অনেক গবেষণা করে তা সিদ্ধান্ত করেছ।"

"তবে আমার বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণে ভগবৎ শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়, সেজন্য তাঁকে পূর্ণাবতারই স্বীকার কর্‌তে হয়।"

"বেশ আমিও এখন থেকে শ্রীকৃষ্ণকে তাই মনে কর্‌ব।"

"অন্ধ বিশ্বাসে?"

"না, তোমার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসে।"

"সেটা ত ঠিক নয়, আমি ত আর একজন ঋষি নই।"

"না, আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, অন্ধ বিশ্বাসই মানুষকে ভক্তিমার্গে নিয়ে যায়। আর ভক্তিমার্গই সহজ পন্থা। ভক্তি ও কর্ম্ম এই দুইটিই অবলম্বন করা আবশ্যক। আমার বেশ জ্ঞান হয়েছে যে, সকল জীবেই নারায়ণ বিরাজ কর্‌ছেন। এবং প্রত্যেক জীব-শরীরই নারায়ণের মন্দির, অতএব যে কোন

মন্দিরেই নারায়ণ পূজা করা কেন যাবে না? ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক আমি আর করব না, যারা জ্ঞানান্ধ তারাই ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক করে। কোন ধর্ম্মই নিন্দনীয় হতে পারে না। ধর্ম্মের গোঁড়ামীই নিন্দনীয়। আমি যে হিন্দু হয়ে জন্মেছি, সেজন্য নিজেকে গৌরবান্বিত বলে মনে করি এবং তোমার মত স্বামী যে পেয়েছি সেজন্যেও সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি।"

"আমিও নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি যে তোমার মত স্ত্রী আমি পেয়েছি। তোমার নিকট আমারও যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। মানুষ তর্কের দ্বারাই একটা সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। আমারও এখন ভগবানে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।"

"দেখ তুমি যে ভাবে বুঝাও, তাতে আমি বেশ বুঝতে পারি। শাস্ত্রী মশায় কেবল বচন আওড়াতে থাকেন, তাকে আমি ভাল বুঝতে পারিনে। তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে আমি বেশ শান্তি পাই। তুমি যখন কোর্টে থাক, সে সময়টা আমার বড়ই কষ্টে কাটে। সে সময়ে কেবল সুরমার কথাই মনে হয়। আমার বুদ্ধির দোষেই সে আমাদের ত্যাগ করে গিয়েছে।"

"কারও দোষে কিছু হয় না। সকলই ভগবৎ ইচ্ছা ও আপন আপন কর্ম্মফল। আমাদের পাপের জন্য ঈশ্বর আমাদের যে শাস্তি দেবেন, তা আমাদের সন্তুষ্ট চিত্তে ঘাড় পেতে স্বীকার করা উচিত। তাতে ক্ষুব্ধ হওয়া কখনই উচিত নয়।"

"কি করব মন যে কিছুতেই বুঝে না।"

"যে সময়ে মন খারাপ হবে সে সময়ে তুমি যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পড়, তা হলে অনেকটা শান্তি পেতে পারবে।"

এই সময়ে গাড়ী-বারান্দায় একখানা মটর আসিয়া থামিল। মাধবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন মোটর এল কোথেকে?"

নরেশ। "কি জানি? কারও ত আসার কথা নেই। আচ্ছা আমি দেখ্‌ছি" —এই বলিয়া নরেশ বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই কুমুদ ও সুরমাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহারা উভয়ে মাধবীকে প্রণাম করিল। মাধবী সুরমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। অশ্রুতে উভয়ের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

বাঁচিবার উপায়।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পল্লী সংস্কারের জটিল সমস্যার সমাধান অথবা জীবিকা সমস্যার মীমাংসা কি প্রকারে হইতে পারে তাহা যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখুন। প্রত্যেকেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান:—

১। যশোহর পোষ্ট আফিস, গ্রন্থকারের নিকট।

২। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বাঁচিবার উপায় সম্বন্ধে

১। হিতবাদীর অভিমত—

"বাঁচিবার উপায় পুস্তকখানি অমৃতের খনি। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের মৃত্যু নিবারণ করিতে হইলে তাহাদের মস্তিকে অমৃত সিঞ্চনের প্রয়োজন। অমৃতই তাহাদের বাঁচিবার উপায়। এ পুস্তকে

বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার জন্য কতকগুলি অমৃত গর্ভ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে কৃষিকার্য্যের অবলম্বন ও উন্নতি-সাধন করিলে বাঙ্গালীর জীবন রক্ষা হইবে। কুকুরের বৃত্তি চাকুরী করিয়া, চাকুরীকে পরমার্থ সাধনের উপায় মনে করিয়া বাঙ্গালী জাতি যে অধঃপাতে যাইতেছে, অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনক্ষম কৌশলে, কখন বা গল্পের ছলে অমৃত প্রবাহের ন্যায় কৃষি-কার্য্যের উপদেশ, কৃষিকার্য্যের শিক্ষা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। পল্লীবাসী প্রত্যেকজনের নারীর এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। যাঁহারা চাকুরীর মোহে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া পৈত্রিক ভিটা বন্য জন্তুকে দান করিয়া সহরের ইট পাটকেল দর্শনে চক্ষুর চরিতার্থতা সম্পাদন করেন, তাঁহাদেরও এই পুস্তক পাঠ করা সঙ্গত। গোলামীর পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা, মৃত্যুর বদলে জীবন, বিষের পরিবর্ত্তে অমৃত মানুষের পক্ষে দুর্লভ নহে। যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই। "বাঁচিবার উপায়" আজ সত্য সত্যই বঙ্গদেশে বাঁচিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছে।"

২। প্রবাসীর অভিমত—

"বঙ্গ দেশের অত্যধিক মৃত্যুর হার, তাহার কারণ ও প্রতিকারের উপায় গ্রন্থকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আলু আক কলা খেজুর প্রভৃতির চাষে কি পরিমাণ খরচে কি পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় গ্রন্থকার তাহার হিসাব নিকাশ দিয়াছেন। চাষ করিবার উপায় গুলিও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বইখানি সাধারণের উপকারে আসিবে।

৩। উড়িয়া পত্র "সহকারের" অভিমত—

(উড়িয়া হইতে অনূদিত)

"বাঁচিবার উপায়" সুন্দর পুস্তক। ইহাতে আলুর আত্মকাহিনী, আখের চাষ, খর্জ্জুর বৃক্ষের আবেদন প্রভৃতি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। আজকাল আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা—ছাত্রেরা যেমন ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে—তাহাতে এই সব পুস্তক পাঠ করিয়া চাষের দিকে মন দিলে ভাল হইবে। লেখক মহাশয় গল্পের ছলে অনেক কথা লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বাস্তবিক উপাদেয় হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু এম, এ
সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির মেম্বর
ও "সহকার" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক।

বাঁচিবার উপায় সম্বন্ধে—"বঙ্গবাসী" কি বলেন শুনুন—

"এই পুস্তকে বাঁচিবার উপায় সম্বন্ধে কেবল অনুমিতি নহে, কিন্তু নানারূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগে বিস্তর কাজের কথা এবং জানিবার কথা বিবৃত রহিয়াছে।"

* * * "ইংরাজী পাসকরা যে সকল বৃত্তিহীন বা দাসত্বলোভী অকর্ম্মার দল অন্নচিন্তায় চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতেছেন সেই সকল হতভাগ্যগণের পক্ষে এ পুস্তক একান্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। অধিকাংশ বিষয় বেশ রসাল ভাষায়—বেশ মজাইয়া গুছাইয়া লেখা * * * এ রূপ প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তকের বহুল বিক্রয় একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

২। অমৃতবাজার পত্রিকার মত—

"An interesting feature of the book is the manner in which the author has attempted to make his words attractive to his readers * * * he has narrated a few stories amusing in themselves and has through the medium of these stories made an attempt with considerable success to convey his meanings to his readers.

The author's excellent preliminary Essay deserves the careful consideration of those, who have the good of their country at heart. In it he has made some

very valuable suggestions for the industrial development of India.

"বঙ্গবাণীর" অভিমত :—

"বাঁচিবার উপায়ের প্রথম প্রস্তাবটী সম্বন্ধে বঙ্গবাণী বলেন, এরূপ প্রস্তাব যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। * * * আমরা একদম ভুলিয়া গিয়াছি যে চাকরি ছাড়া আরও অনেক পথ আছে যদ্বারা সহজে জীবিকার্জ্জন হইতে পারে। * * * এইরূপ স্কীমের আলোচনায়ও জাতীয় জড়তা ক্রমে কাটিতে পারে। গ্রন্থকার * * * সরল ভাবে দেশের হিত কথা কহিয়াছেন সে জন্য তিনি প্রশংসার্হ।"

"কৃষি সম্পদ" পত্রিকার অভিমত—

"বাঁচিবার উপায়" একখানি সুপাঠ্য কৃষি গ্রন্থ। বোধ হয় ইহাই গল্প কৃষি সাহিত্য নির্ঘণ্টে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমস্থানীয়।

রামহরি বাবু এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কৃষি-সাহিত্য বিভাগে একখানি অভিনব ও উপাদেয় গ্রন্থের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনি গল্পের ভিতর দিয়া বহু কৃষিতত্ত্বের সম্ভার আনয়ন করিয়া কৃষি-সাহিত্যের একটী বিশেষ অভাব মোচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা সর্ব্বথাই প্রসংসার্হ।

* * * * *

যাঁহারা চাকরির মোহ ছাড়িয়া স্বাধান ভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের ইচ্ছা করেন এ পুস্তক তাঁহাদের উপকারে আসিবে এবং যাঁহারা কৃষি কর্ম্মাধ্যায়ী ইহা তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ হইবে। বঙ্গীয় যুবকেরা যদি একটী সপ্তাহ কাল উপন্যাস পাঠ বন্ধ করিয়া, পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশ মনোযোগের সহিত পাঠ করে, তাহা হইলে তাহারা স্বাবলম্বী হইয়াই স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার একটা প্রকৃষ্ট উপায় জানিতে পারিবে ; এবং বাঁচিবার উপায় করিয়াও লইতে পারিবে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এ গ্রন্থ একান্ত পাঠ্য। * * * উপন্যাস বা গল্পপ্রিয় পাঠকেরা উপকথায় আকৃষ্ট হইয়াও যদি "বাঁচিবার উপায়" পাঠ করে তাহা হইলেও তাহারা বাঁচিবার উপায় করিয়া লইতে পারিবে।

যশোহর পত্রিকার অভিমত—

* * * ইহা দ্বারা ধ্বংসোন্মুখ পল্লীভূমির সংস্কারের পন্থা,

জমিদারের এবং প্রজার সমবায়ে সমাজের উন্নতির প্রস্তাবটী যথার্থই সুচিন্তিত এবং কার্য্যকরী। * * *

রামহরি বাবুর স্বভাব-সরল লিখন ভঙ্গিমা ও রচনামাধুর্য্যে নীরস বিষয়টীও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। * * *

* আলুর আত্মকাহিনী ও মুস্কিল-আসান অর্থাৎ কচুর কৌতুককাহিনী বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। * * *

এই উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে এই প্রয়োজনীয় পুস্তকখানির সমাদর হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

১। ঘরে-পরে ... মূল্য ১৷৹।

প্রবীণ সাহিত্যিক-প্রবর স্বর্গগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত :—* * * আপনি একটি মহান আদর্শকে মহিমান্বিত করিয়া ধরিয়াছেন * * কিন্তু এ সাধু পরামর্শ দেশের লোকে গ্রহণ করিবে কি? আমি সকলকে পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

২। ভুল ... মূল্য ১৲।

প্রবাসীর সুযোগ্য সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"আপনার হাত অতি মিষ্ট, লেখা ঝরঝরে। লহরীর চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হয়েছে।"

৩। **ব্যথার সুখ** (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—১৷৹

বঙ্গবাসী বলেন—"প্রারম্ভ বড়ই সুন্দর। সেই প্রারম্ভ—ভিত্তির উপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন চরিত্রের সমবায়ে এবং সংঘর্ষে এই উপন্যাস পুস্তক রচিত। বিশ্বারম্ভের চরিত্র অতীব সমুজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাসি, কণক, সুধাংশু, সনত, সরোজ প্রভৃতি পারিবারিক ঘটনা-সংযুক্ত অনেকেরই চরিত্র যথাযোগ্যরূপেই চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনা-চিত্রণ অতীব স্বাভাবিক; যেমন রেল ষ্টেশনে, 'জেণ্টল্‌ম্যান্‌স্‌ ওয়েটিং রুমে' এদেশীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অবমাননা, বৃদ্ধ বিশ্বারম্ভের সৎ-শিক্ষায় বাল-বিধবা হাসির শাস্ত্রাদিষ্ট বৈধব্যাচার গ্রহণ অথচ পিত্রালয়ে

অন্ন-শিক্ষা প্রাবল্যে তাহার বাধ্যতামূলক আংশিক পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। ভাষা অতীব মনোহারিণী, ভাব গভীর অথচ মধুর কবিত্বময়ী। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ বহু পরিমাণে সম্ভবপর ইহাই আমাদের ধারণা।

৪। **নিরুক্তা** মূল্য—১॥০

সম্মিলনী বলেন—"পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। লেখকের হিন্দু সংসার ও দরিদ্র পল্লী-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রচুর। বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় মাধুর্য্য ও কোথায় বিরসতা তাহা লেখক অভ্রান্ত ভাবেই ধরিয়াছেন। পল্লীসংসারের সুখ দুঃখের বৈচিত্র্যের মধ্যে লেখকের সহৃদয়তা ও আন্তরিক সহানুভূতি অনেক স্থলেই পরিস্ফুট। চিত্র হিসাবে বই খানি উপাদেয়। সর্ব্বত্র সুরুচি ও সুনীতির সহিত কল্পনার সংযম দৃষ্ট হয়।"

৪। খেয়াল ... মূল্য ১৲

৫। স্মৃতি তর্পণ ... মূল্য ৸০

স্মৃতি তর্পণ সম্বন্ধে কবিবর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের অভিমত—

"তোমার স্মৃতি তর্পণ পড়িলাম। তোমার কবিতা আমার ভালই লাগে। এ স্মৃতি তর্পণ শুধু তোমার নয়—সারা বঙ্গদেশের স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের। কবিতাগুলি প্রাণ দিয়া লেখা। জানি না বঙ্গদেশে এমন কেহ ভাগ্যবান আছেন কিনা—যিনি তোমার "খুলিয়াছি বাক্সটি তার"—পড়িয়া অন্ততঃ একবারও মনে মনে না বলিবেন—"হায় খুলিয়াছি বাক্সটি তার।" আশা করি বঙ্গবাণীর আরাধনায় তোমার যশ দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে।"

প্রাপ্তিস্থান—

স্বস্ত্যয়ন-সাহিত্য-মন্দির

মহেশপুর পোষ্ট (যশোহর)

ও বরেন্দ্র লাইব্রেরী ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।